৪৩-৪৪

বাংলাপিডিএফ

দস্যু বনহুর

নাগরিক দস্যু বনহুর
কাপালিক ও দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

রনি

নাগরিক দস্যু বনহুর-৪৩
কাপালিক ও দস্যু বনহুর-৪৪

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো বনহুর—রাণী দুর্গেশ্বরী তুমি! হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে। সে হাসির প্রতিধ্বনি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো গোটা পোড়োবাড়ির কন্দরে কন্দরে। হাসি থামিয়ে বললো বনহুর— আমি জানতাম তুমি মরোনি।

দুর্গেশ্বরী নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো। বনহুরের দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে তার গণ্ডদ্বয়।

বনহুর বললো আবার— যেদিন শুনলাম রাজা তোমার অনুরোধে তোমারই নির্দিষ্ট স্থানে তোমাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করেছেন তখনই বুঝেছিলাম সবকিছু। আজ তুমি মহারাণী দুর্গেশ্বরী নও, তাই তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করলাম, নিশ্চয়ই মনে কিছু করোনি।

এবার রাণী দুর্গেশ্বরী চোখ তুলে তাকালো বনহুরের দিকে, কিন্তু কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর লক্ষ্য করলো, সেদিন রাণী দুর্গেশ্বরীর দৃষ্টির মধ্যে ছিলো এক উগ্রভাব, আজ সেখানে কোমল এক নারীসুলভ চাহনি পরিলক্ষিত হলো। বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দৃষ্টি নত করে নিলো রাণী দুর্গেশ্বরী।

বনহুর রুক্ষ-কঠিন স্বরে তিরস্কার করবে ভেবেছিলো কিন্তু রাণী দুর্গেশ্বরীর চাহনি তার মনকে নরম করে আনলো, তবু গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর— আমি জানতে চাই, এ ছবি তুমি কেন এঁকেছো? কোন্ অধিকারে তুমি আমার ছবি এঁকেছো বলো? জবাব দাও?

দুর্গেশ্বরী সম্পূর্ণ নীরব।

বনহুর বললো—জবাব না দিলে আমি এক্ষুণি এ ছবি নষ্ট করে ফেলবো।

দুর্গেশ্বরী সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের পায়ের কাছে বসে পড়ে তার পা দু'খানা চেপে ধরলো হাত দু'খানা দিয়ে— তুমি আমাকে হত্যা করো বনহুর, তবুও ছবি তুমি নষ্ট করো না। আমার সারা জীবনের সাধনা ঐ ছবি.....উঠে

দাঁড়ালো দুর্গেশ্বরী, বস্ত্রমধ্য হতে বের করে আনলো একখানা ছোরা, বাড়িয়ে ধরলো বনহুরের দিকে—নাও, আমাকে হত্যা করো.....

বনহুর নির্বাক বিস্ময়ে তাকালো দুর্গেশ্বরীর দিকে, আজ এক নতুন রূপ ধরা পড়লো বনহুরের চোখে। সেই উগ্র নারীমূর্তির অন্তরালে এমন একটা কোমল রূপ লুকিয়ে ছিলো ভাবতে পারে না বনহুর। এই মুহূর্তে ওর হাতের ছোরাখানা নিয়ে ওকে হত্যা করতে পারে কিন্তু নারীহত্যা করা বনহুরের স্বভাব নয়। তাছাড়া দুর্গেশ্বরী এই দন্ডে তার কাছে অপরাধিনী নয় বরং সে ক্ষমাপ্রার্থিনী।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর হাত থেকে ছোরাখানা কেড়ে নিলো, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো—তোমার মত পিশাচিনী পাপময়ী নারীকে হত্যা করে আমার হাত কলুষিত করতে চাই না। আমি জানতে চাই.....

বাধা দিয়ে বলে উঠলো দুর্গেশ্বরী—না না, তুমি আমার কাছে জানতে চেওনা কেন আমি এ ছবি এঁকেছি।

তোমাকে বলতে হবে, কোন্ অধিকারে তুমি আমার প্রতিচ্ছবি আঁকলে?

দুর্গেশ্বরীর মুখমন্ডল ব্যথাকাতর হয়ে উঠলো, বললো সে—আমার অন্তরের আহ্বানে আমি এ ছবি এঁকেছি। আর অধিকার পেয়েছি আমার মনের কাছে.....

তোমার এতোটুকু লজ্জাবোধ থাকলে তুমি কোনোদিন এ কাজ করতে পারতে না।

বলো, যত খুশি তত বলো বনহুর, আমি সব সহ্য করবো। তবু একটি অনুরোধ আমার— তোমাকে ভালোবাসার অধিকার থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না। তোমার স্মৃতিই যে আমার জীবনের সম্বল।

একটা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে, বললো—এমনি আরও কত পুরুষের স্মৃতি তুমি মনের গহনে এঁকে রেখেছো সুন্দরী?

বিশ্বাস করো, কারো স্মৃতিই আমার মনের পর্দায় রেখাপাত করতে পারেনি আজও, এমন কি আমার স্বামী মহারাজের স্মৃতিও নয়। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মনে একমাত্র তুমিই আসন গেড়ে নিয়েছো। জানি না তুমি আমাকে কোনো যাদু করেছো কিনা। কেন আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। জানি না, জানি না কেন....

বনহুরের মনে একটা সহানুভূতির সুর জেগে উঠে, বলে—দুর্গেশ্বরী, তুমি জানো না আমাকে ভালবেসে তুমি নিজের কাছে নিজেই বঞ্চিত হয়েছো।

না, আমি বঞ্চিত হইনি, হবোও না কোনোদিন।

তুমি উম্মাদ হয়ে গেছো দুর্গেশ্বরী।

না, উম্মাদ আমি হইনি.....

তাহলে এমন কথা তুমি বলতে পারতে না। কোনোদিন তুমি আমাকে পাবে না দুর্গেশ্বরী।

তোমার রক্তে-মাংসে গড়া দেহটা না পেতে পারি কিন্তু তোমার চিন্তা থেকে আমাকে কোনোদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমার স্মৃতির পরশ আমাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

আবার বনহুর হেসে উঠে অদ্ভুতভাবে—হাঃ হাঃ হাঃ, স্মৃতির পরশ...চমৎকার, চমৎকার নারী তুমি! নারীরত্ন তুমি! একজনের স্মৃতি আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চাও?

হাঁ বনহুর, তোমার স্মৃতি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল ধরে। তুমি শুধু তোমার ছবিখানাকে পূজা করার অধিকার আমাকে দাও।

বিস্ময়ে ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠলো বনহুরের, বললো—পূজা?

হাঁ, পূজা....

বনহুর স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন, বলে কি দুর্গেশ্বরী! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো সে ওর মুখের দিকে। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—বেশ, তাতেই যদি তুমি তৃপ্তি পাও, করো।

দুর্গেশ্বরী পুনরায় বসে পড়লো বনহুরের পায়ের কাছে, আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—বনহুর! বনহুর...

বনহুর দুর্গেশ্বরীর হাত দু'খানা ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি তোমাকে যা বলবো তাই করতে হবে।

আদেশ করো? যা বলবে তাই করবো আমি।

প্রথম কথা হলো, আমার তিনজন লোক তোমার অনুচরদের হাতে বন্দী হয়েছে— তাদের মুক্তি দিতে হবে।

বেশ, তাই দেবো।

আর তোমাকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে।

আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম।

আমাকে স্পর্শ করে শপথ করতে হবে।

দুর্গেশ্বরী বনহুরের পা দু'খানা দু'হাতে চেপে ধরে বললো—আমি তোমাকে স্পর্শ করে শপথ করলাম, এখন হতে সৎপথে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলাম। নিজকে আমি বিলিয়ে দেবো পরের উপকারের জন্য....

আজ আমি সন্তুষ্ট হলাম দুর্গেশ্বরী। চলো, এবার আমার বন্দীদের মুক্তি দেবে চলো।

চলো বনহুর....দুর্গেশ্বরী আঁচলে অশ্রু মুছে উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে চললো পাতালপুরীর গোপন পথ ধরে।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর সঙ্গে এগুতে এগুতে লক্ষ্য করলো, সত্যি বিস্ময়কর এ পথ— ভূগর্ভে তার যে আস্তানা রয়েছে তার চেয়েও দুর্গম কঠিন এ পথ।

নির্জন অপরিসর আঁধো অন্ধকার গলিপথ। শক্ত পাথর কেটে এ পথ তৈরি করা হয়েছে। অন্ততঃপক্ষে পৃথিবী হতে চল্লিশ ফুট মাটির তলায় এ দুর্গম সঙ্কীর্ণ পথটি, সেই পথে এগিয়ে চলেছে দুর্গেশ্বরী আর দস্যু বনহুর।

অনেক পথ এগিয়ে এলো তারা।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—আমায় তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

থমকে দাঁড়ালো দুর্গেশ্বরী, এখনও তার দেহে সেই শুভ্র ড্রেস শোভা পাচ্ছে। নত দৃষ্টি তুলে বললো—তোমার আমি কোনো ক্ষতি করবো না বনহুর। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।

বনহুর বললো—বিশ্বাস না করলে এতোক্ষণ তোমাকে আমি হত্যা করতাম, বুঝলে?

আমিও তোমাকে হত্যা করতে পারতাম বনহুর।

কিন্তু আমি জানি, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না।

কারণ?

তুমি আমাকে ভালবাসো।

বনহুর, তোমার মুখে এই কথাটা শোনবার জন্য আমি এতোদিন প্রতীক্ষা করেছি। আমি তোমায় ভালবাসি বনহুর....দুর্গেশ্বরী বনহুরের হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরলো।

নির্জন নিভৃত গলিপথে বনহুর যুবক আর রাণী দুর্গেশ্বরী যুবতী— উভয়ের পক্ষেই নিজ নিজকে সংযত রাখা কঠিন। কিন্তু বনহুর কঠিনপ্রাণ পুরুষ, দুর্গেশ্বরীর আবেগ-বিহ্বল আচরণে সে এতোটুকু বিচলিত বা অসংযত হলো না, বললো সে— তুমি আমায় ভালবাসো বিশ্বাস করবো যদি তোমার শপথ রক্ষা করো।

হাঁ বনহুর, আমি আমার শপথ রক্ষা করবো।

চলো।

চলো বনহুর।

এ পথে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো দুর্গেশ্বরী?

আমার সারা জীবন সঞ্চিত রত্নভান্ডারে।

তার মানে, আমাকে তুমি মোহগ্রস্ত করতে চাও?

না।

তবে রত্নভান্ডারে কেন?

পরে সব বলবো চলো।

বনহুরের মনে দারুণ বিস্ময় জাগে। কোনো কথা না বলে অনুসরণ করে দুর্গেশ্বরীকে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা বিরাট গুহামুখের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো দুর্গেশ্বরী, পাশের দেয়ালে চাপ দিতেই খুলে গেলো পাথরের দরজা। বেরিয়ে এলো একটা সুড়ঙ্গমুখ।

বনহুর কিছু বলতে যচ্ছিলো, দুর্গেশ্বরী বললো— এসো।

দুর্গেশ্বরী প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গমধ্যে।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো সে। সুড়ঙ্গমধ্যে পাথরের দু'পাশে অসংখ্য মনিমুক্তাখচিত রৌপ্য-সিন্দুক থরে থরে সাজানো।

দুর্গেশ্বরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো এবার— বনহুর, এই যে সব মনিমুক্তাখচিত রৌপ্য-সিন্দুক দেখছো, এতে আছে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। আমি লক্ষ লক্ষ অসহায়ের বুকের রক্তে এসব মুদ্রা/সঞ্চয় করেছি। রক্তের নেশায় একদিন আমি মেতে উঠতাম। হত্যায় পেতাম আমি আনন্দ, নিজ হস্তে শত শত লোকের মস্তক আমি ছিন্ন করেছি।

দুর্গেশ্বরীর কথাগুলো নির্জন সুড়ঙ্গমধ্যে বড় অদ্ভুত শোনাতে লাগলো, কেমন যেন ভাবগম্ভীর থমথমে সে কণ্ঠস্বর। দস্যু বনহুর নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে দুর্গেশ্বরীর মুখে।

দুর্গেশ্বরী বলে চলেছে— মায়াহীন নির্মম ছিলো আমার প্রাণ। এসো বনহুর, আমার সেদিনের কীর্তি তুমি দেখবে চলো।

বনহুর দুর্গেশ্বরীর সঙ্গে পা বাড়ালো, কিছু পথ অগ্রসর হবার পর একটা গুহার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। গভীর মাটির নিচে এমন সুড়ঙ্গপথ আর পাথরের তৈরি গুহা অত্যন্ত আশ্চর্য। বনহুরও দাঁড়িয়ে পড়লো ওর পাশে।

দুর্গেশ্বরী দেয়ালে চাপ দিতেই খুলে গেলো গুহার কপাট। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের চোখ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেলো, দেখলো গুহার মধ্যে অসংখ্য নরকঙ্কাল স্তূপাকার হয়ে আছে।

দুর্গেশ্বরী বললো— এই যে নরকঙ্কাল দেখছো, এসব আমারই পাপের জ্বলন্ত প্রমাণ। সবগুলো লোককে আমি হত্যা করেছি বনহুর। সেকি নির্মম নিদারুণ করুণ হত্যা...গলা ধরে আসে দুর্গেশ্বরীর।

বনহুর সহসা কোনো কথা বলতে পারলো না। সে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেছে, জীবনে সে বহু নরহত্যা দেখেছে কিন্তু এমন দৃশ্য সে কমই দেখেছে। নারী হয়ে এমন নরহত্যাকারী সে কোনোদিন দেখেনি। একবার মনে হলো, এই মুহূর্তে দুর্গেশ্বরীকে চরম শিক্ষা দেয়, কিন্তু সামলে নিলো বনহুর নিজকে। কারণ সে নিজে তার দোষ মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছে।

দুর্গেশ্বরী বললো আবার— এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে চাই বনহুর। আমার সারা জীবনের সঞ্চয় তুমি গ্রহণ করে আমাকে মুক্তি দাও।

এতক্ষণে বনহুর যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। চমকে উঠে সে দুর্গেশ্বরীর কথায়, ভ্রূজোড়া টান করে বলে—কি বললে রাণী?

না না, রাণী, তুমি আমাকে অন্য নামে ডাকো।

দুর্গেশ্বরী....

না, দুর্গেশ্বরী মরে গেছে, তুমি একটা নাম আমার বেছে দাও। যে নাম ধরে ডাকলে আমার মন হালকা হবে।

বেশ, আমি তোমার নাম দিলাম, আজ থেকে নরপিশাচিনী দুর্গেশ্বরী নাম মুছে তোমার নাম হলো দেবরাণী!

দুর্গেশ্বরীর চোখ দুটো আনন্দে জ্বলে উঠলো, দীপ্ত হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল।

বনহুর লক্ষ্য করলো দুর্গেশ্বরীর মুখোভাব, সেও খুশি হলো মনে মনে, বললো— তোমার এ সম্পদ তোমারই রইলো, তুমি পৃথিবীর শত শত অসহায় জনগণের মঙ্গলার্থে এসব বিলিয়ে দিতে পারো।

তুমি যাতে সুখী হও আমি তাই করবো বনহুর।

বেশ, তাই করো।

আমাকে কথা দাও, যখন আমি তোমায় স্মরণ করবো তখনই তুমি আমার ডাকে সাড়া দেবে?

হেসে বললো বনহুর— দেবো।

সত্যি কথা দিলে?

দিলাম।

চলো, এবার তোমার সঙ্গীদের মুক্ত করে দিয়ে আসি।

চলো।

বনহুর আর দুর্গেশ্বরী ফিরে এলো পূর্বের সেই কক্ষে, যে কক্ষে বনহুরের প্রতিচ্ছবিখানা পুষ্পশোভিত স্বর্ণমঞ্চে রক্ষিত ছিলো। সম্মুখের ধুপদানী থেকে তখনও ধুম্ররাশি নির্গত হচ্ছিলো। কক্ষটা এ মায়াময় পরিবেশে আকৃষ্ট ছিলো। বনহুর ক্ষণিকের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলো তার নিজের ছবিখানার দিকে।

দুর্গেশ্বরী প্রণাম করলো বনহুরের পায়।

চমকে উঠলো বনহুর— একি করছো!

তোমাকে শেষবারের মত প্রণাম করলাম। দুর্গেশ্বরী উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে, বললো—তোমার দেওয়া নাম ধরে একবার ডাকো আমাকে। তোমার কণ্ঠে শুনতে চাই বনহুর আমার সেই নাম....

বনহুর দুর্গেশ্বরীর চিবুকটা উঁচু করে ধরে বললো— দেবরাণী, আজ থেকে তুমি সত্যিই দেবরাণী হয়েছো। দুর্গেশ্বরী মরে গেছে সম্পূর্ণভাবে।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলো দুর্গেশ্বরী— বনহুর!

দেবরাণী, চলো এবার ....

ওরা দু'জনা একটা লিফটের মত আসনে উঠে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে আসনটা উপরে উঠতে লাগলো। অল্পক্ষণেই তারা সেই কক্ষে এসে দাঁড়ালো যে কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে রহমান, নূরী আর নাসরিনকে।

কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিলো, দুর্গেশ্বরীকে দেখামাত্র তারা অস্ত্র নিচু করে অভিবাদন জানালো।

দুর্গেশ্বরী বললো— বন্দীদের বন্ধন উন্মোচন করে দাও।

প্রহরিগণ দুর্গেশ্বরীর আদেশ পালন করলো।

নূরী মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে— হুর... হুর ... আমার হুর...

দুর্গেশ্বরীর দু'চোখে প্রথমে বিস্ময় জাগলো, পর মুহূর্তে দৃষ্টি নত করে নিলো সে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে।

❑

গোরী রাজ্যের অদূরে পোড়োবাড়ির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফিরে আসে বনহুর সঙ্গে রহমান, নূরী ও নাসরিনকে নিয়ে। বনহুরের মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দ— দস্যুরাণী দুর্গেশ্বরী তার কু-কর্ম ত্যাগ করে নতুন জীবন লাভ করেছে। তার দ্বারা জনগণের আর কোনো অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা নেই।

বনহুর নিশ্চিন্ত মনে আস্তানায় বিশ্রাম করতে লাগলো। নিজ শয্যায় শয়ন করে ভাবছে গত কয়েক দিন আগের কথা। পোড়োবাড়ির গহ্বরে সেই অদ্ভুত রহস্যময় সুড়ঙ্গপথের কথা। সবচেয়ে বনহুরকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে দুর্গেশ্বরী হাতে আঁকা তার নিজের ছবিখানা। শুধু বিস্ময়ভরাই নয়, একেবারে অত্যাশ্চর্য— কি করে তাকে হুবহু বন্দী করেছে ক্যানভাসের বুকে। তারই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি!

বনহুর আপন মনে ভাবছিলো সেই কথা, এমন সময় বনহুরের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে নূরী। চুপি চুপি শয্যার পাশে এসে দাঁড়ায়, বিনুনী দিয়ে একটুখানি নাড়া দেয় বনহুরের চিবুকে।

চমকে উঠে বনহুর, ফিরে তাকাতেই খিলখিল করে হেসে উঠে নূরী, বলে সে—বড্ড চমকে দিয়েছি, দস্যুসম্রাট কি ভাবছিলে শুনি?

বনহুর বালিশটা টেনে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বললো—তোমার কথাই ভাবছিলাম নূরী।

আমার কথা?

হাঁ, তোমার কথা। ভাবছিলাম কি দুঃসাহস তোমার, রহমানের সঙ্গে কোন্ সাহসে তুমি আর নাসরিন গোরীর সেই পোড়োবাড়ি গিয়েছিলে?

তোমাকে খুঁজতে।

হেসে উঠে বনহুর অদ্ভুতভাবে, তারপর বলে—পেয়েছিলে আমাকে?

এই তো পেয়েছি। বললো নূরী।

বনহুর পূর্বের সুরেই বলে—না, তোমরা আমাকে পাওনি, আমি নিজেই এসেছি। আমি যদি না আসতাম, কোনোদিনই তোমরা আমাকে খুঁজে পেতে না।

নূরী এবার বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়লো, বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো—সত্যি তোমাকে কোনোদিন আর খুঁজে পেতাম না আমরা, যদি তুমি ফিরে না আসতে। হুর, বলো ঐ মেয়েটি কে ছিলো তোমার সঙ্গে?

যার কথায় তোমরা মুক্তি পেলে?

হাঁ, সেই দেবীমূর্তি নারী....

তুমি যাকে দেবীমূর্তি বলছো, জানো না নূরী, সে কতবড় পিশাচিনী, কত ভয়ঙ্কর নারী!

এ তুমি কি বলছো হুর?

তুমি চুপ করে বসো, আমি তোমাকে ঐ দেবীমূর্তি সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলছি। অতি বিস্ময়কর নারী সে, ওর নাম রাণী দুর্গেশ্বরী...

শুনেছি দুর্গেশ্বরী গোরী রাজ্যের রাণী?

হাঁ, একদিন ছিলো কিন্তু আজ সে গোরী রাজ্যের রাণী নয়।

তবে কি সে?

এখন সে দেবরাণী...শোনো তার সম্বন্ধে বলছি।

বনহুর গোরী রাজ্যের মহারাজ এবং তার দুঃসাহসী রাণীর কীর্তিকলাপ সব বলে যায়, পোড়োবাড়ির সব কাহিনীও বলে সে নূরীর কাছে, তার ছবি খানার কথাও গোপন করে না বনহুর।

সব শুনে নূরী হতভম্ব বিস্মিত হয়। ঢোক গিলে বলে নূরী— রাণী দুর্গেশ্বরী তাহলে তোমাকেও বন্দী করে রেখেছে তার ভূগর্ভ কক্ষে, একদিন তোমাকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে....

নূরীর কথায় একটা স্মিত হাসির আভাস ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে, বললো—ভক্তের ডাকে দেবতার সাড়া না দিয়ে উপায় কি বলো? যাক্ সে কথা, অনেকদিন ঝরণার পানিতে প্রাণ ভরে সাঁতার কাটা হয়নি— চলো নূরী, আজ এই জোছনাভরা রাতে আমরা ঝরণায় সাঁতার কাটবো।

বনহুরের কথায় নূরীর মন নেচে উঠলো যেন, সেও তো অনেক দিন ঝরণার পানিতে মন ভরে সাঁতার কাটতে পারেনি। সে পাহাড়ী মেয়ের মতই চঞ্চল, উচ্ছল মুখরা মেয়ে। জন্মাবার পর থেকেই বন-জঙ্গল , নদী-নালা-ঝরণার সঙ্গে তার প্রাণের সম্বন্ধ। বনের পশু-পাখী-জীবজন্তু ওর খেলার সাথী। দু'চার দিন যদি এদের ছেড়ে দূরে থাকে সে, তাহলেই হাঁপিয়ে উঠে। সব সময় ফাঁক খোঁজে কখন ছাড়া পাবে, ছুটে যাবে সে তার চিরসাথী বনানীর বুকে। খেলা করবে হরিণ আর হরিণীর সাথে। সাঁতার কাটবে রাজহংসীর পাশে পাশে।

নূরী বনহুরের হাত ধরে বলে—চলো তাহলে, আর বিলম্ব সইছে না।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো— চলো।

বনহুর আর নূরী আস্তানার বাইরে এসে দাঁড়ালো, তাজ আর দুলকী অপেক্ষা করছিলো।

বনহুর তাজের পিঠে বসলো, নূরী চেপে বসলো দুলকীর পিঠে।

অন্ধকার অশ্ব দুটি ছুটে চললো কান্দাই জঙ্গলের দক্ষিণ ঝরণার দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেলো ঝরণার পাশে।

জোছনাভরা পৃথিবী।

মুক্ত আকাশ।

ঝরণার সচ্ছ জলধারার বুকে জোছনার আলো পড়ে অপূর্ব এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে বনহুর নেমে নূরীকে নামিয়ে নিলো অশ্ব থেকে। ওর হাত ধরে এগিয়ে চললো ঝরণার দিকে।

নূরী নিজের হাতে বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিলো।

তারপর ওরা দু'জনা ঝরণার সচ্ছ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, সাঁতার কেটে এগিয়ে চললো পাশাপাশি। নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে পানি ছিটিয়ে দিতে লাগল।

বনহুর ওকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই নূরী ঝরণার জলে ডুব দিলো।

জোছনার আলোতে বনহুর ওকে খুঁজতে লাগলো পানির মধ্যে।

নূরী ডুব দিয়ে বনহুরের পিছনে এসে ভেসে উঠলো, হেসে উঠলো সে খিলখিল করে।

বনহুর ওকে ধরে ফেললো খপ্ করে।

দু'জনার হাসির শব্দে মুখর হয়ে উঠলো বনভূমি, ঝরণার পানিতেও ছড়িয়ে পড়লো সে হাসির উচ্ছলতা।

একসময় বনহুর আর নূরী অশ্বপৃষ্ঠে চেপে ফিরে এলো আস্তানায়।

নূরী ওর বিশ্রামকক্ষে চলে গেলো ভিজে কাপড় পাল্টাবার জন্য।

বনহুর নিজ দেহের বসন পাল্টে নিয়ে আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। চুলগুলো আঁচড়ে নিলো চিরুণী দিয়ে, তারপর সোজা গিয়ে হাজির হলো নূরীর কক্ষে।

নূরীর তখনও কাপড় পাল্টানো হয়নি, বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী নিজের ওড়নাখানা সম্মুখে পর্দার মতো মেলে ধরলো, বললো— কার আদেশে তুমি এ কক্ষে প্রবেশ করলে?

বনহুর মৃদু হেসে বললো— আমার ইচ্ছার আদেশে।

বেরিয়ে যাও বলছি।

যদি না যাই?

শাস্তি পেতে হবে।

বেশ, তাই গ্রহণ করবো। কথাটা বলে এগিয়ে যায় বনহুর নূরীর দিকে।

নূরী লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেলো।

বনহুর একেবারে ওর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, দক্ষিণ হস্তে চিবুকটা উঁচু করে ধরে বললো—দাও, শাস্তি দাও— কি শাস্তি দেবে?

নূরী পালাবার চেষ্টা করলো।

বনহুর ধরে ফেললো ওকে, বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।

❑

নূরী বনহুরকে সাজিয়ে দিলো আপন হাতে, জামার বোতাম লাগিয়ে দিয়ে বললো— যাও হুর, মনিরা আপার সঙ্গে দেখা করে এসো।

বনহুর পাগড়ীটা মাথায় পরে ঠিক করতে করতে বললো—তুমি যাবে না নূরী?

না, আজ নয়।

মনিকে দেখতে যাবে না?

যাবো কিন্তু আজ নয়.....একটু থেমে বললো নূরী, একদিন রাতের অন্ধকারে আমাকে তুমি নিয়ে যেও, গোপনে আড়াল থেকে ওকে আমি দেখে আসবো। আজ তুমি যাও হুর.....

বনহুর আর নূরী আস্তানার গুহামুখে এসে দাঁড়ালো।

তাজসহ দু'জন অনুচর অপেক্ষা করছিলো, রহমানও ছিলো সেখানে।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

রহমান ও অনুচরদ্বয় কুর্ণিশ জানিয়ে সরে দাঁড়ালো।

নূরী অস্ফুট কণ্ঠে বললো— খোদা হাফেজ!

অল্পক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো বনহুর।

নূরীর বুক চিরে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। ফিরে এলো নূরী নিজের ঘরে।

এতোক্ষণ নাসরিন আড়ালে থেকে সব লক্ষ্য করছিলো, নূরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই নাসরিন তার পাশে এসে দাঁড়ালো, শান্ত কণ্ঠে ডাকলো—নূরী!

নূরী ছোট্ট একটু জবাব দিলো—কি?

বসে পড়লো নূরী শয্যার পাশে।

নাসরিনও বসলো, বললো— নূরী, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করবো, সঠিক জাবাব দিবি তো?

বলবার মত হলে নিশ্চয়ই বলবো।

নাসরিন নূরীর পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো, তীক্ষ্ণ নজরে দেখে নিলো সে নূরীর মুখমন্ডল, তারপর বললো— সত্যি বল্‌ছি, সর্দারকে পাঠাতে তোর মনে এতোটুকু বাধলো না?

অবাক হয়ে বললো নূরী— তার মানে? আমি তোর কথা ঠিক বুঝর্তে পারছি না নাসরিন?

তা পারবি কেন! বলছি সর্দারকে ওখানে পাঠাতে তোর মনে একটুও কি বাধে না নূরী?

নূরী এবার স্পষ্ট বুঝে নিলো নাসরিনের কথার মানেটা। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বলে নূরী— ওখানে মানে চৌধুরীবাড়িতে?

হাঁ, তোর মনিরা আপার ওখানে।

নাসরিন, তুই কি জানিস না কেন তাকে ওখানে পাঠিয়ে দেই?

জানি, আর জানি বলেই আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি।

সব জেনেও তুই না বুঝার ভান করিস কেন বল্‌তো? একটু থেমে উদাস কণ্ঠে বলে নূরী, ওকে আটকে রাখার মত ক্ষমতা আমার নেই নাসরিন তাই....বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর কণ্ঠ।

রাগতঃকণ্ঠে বলে উঠলো নাসরিন— কোনো নারীই এমন নেই, যে তার স্বামীকে বিনা দ্বিধায় দ্বিতীয় কোনো নারীর হাতে তুলে দিতে পারে। যেমন করে সর্দারকে তুই....

নূরী নাসরিনের মুখে হাতচাপা দেয়— চুপ কর নাসরিন, চুপ কর তুই। বুঝবি না তুই আমার মনের কথা।

বুঝতে আমি চাই না। শুধু আশ্চর্য হয়ে যাই আমি তোর আচরণ দেখে। স্বামীকে আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে হাসিমুখে কেউ ফিরে আসতে পারে না।

আমি পারি নাসরিন, আমি পারি। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে কি যেন ভাবে নূরী, তারপর আবার বলে— মেয়েদের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ হলো তার স্বামী। বনহুর আমার অমূল্য সম্পদ....আমি আমার সেই সম্পদ কেন তুলে দেই অপর আর একজনের হাতে জানিস? কত ব্যথা আমি বুকে চেপে হাসিমুখে ওকে বিদায় দেই তোকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না নাসরিন। ওখানে যাবার জন্য যখন আমি নিজের হাতে ওকে সাজিয়ে দেই তখন আমার বুকের ভিতরে ঝড় বইতে থাকে কিন্তু আমি মুখে হাসি টেনে সব ব্যথা চেপে রাখি অতি সাবধানে। যেন আমার হুর বুঝতে না পারে আমার মনের ব্যথা....

আশ্চর্য মেয়ে তুই! তোকে দেখে একটুও বুঝবার জো নেই তোর ভিতরে কি হচ্ছে। কিন্তু ওভাবে সর্দারকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয় নূরী।

ওর উপর আমার যেমন দাবী রয়েছে তেমনি রয়েছে মনিরা আপার। হুর আমার একার নয়....গলা ধরে আসে নূরীর। গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

নাসরিন বলে— যা ভেবেছিলাম তা নয়। নূরী, তোর হাসি ভরা মুখ দেখে তোর ভিতরটা বুঝবার জো নেই।

হাঁ, নাসরিন, আমার মত সুখীও যেমন নেই, তেমনি আমার মত দুঃখীনিও নেই এ পৃথিবীতে। আমার বনহুরের মত সম্পদ পেয়েও আমি তাকে.....না না, চলে যা, নাসরিন আমার কাছ থেকে চলে যা। আমাকে একা থাকতে দে এখন।

নাসরিনকে কথাটা বলেই নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলো। আংগুলের ফাঁকে ঝরে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। দারুণ উষ্ণতায় বরফ গলে যেমন পানি হয়ে গড়িয়ে পড়ে, তেমনি নাসরিনের কথায় নূরীর বুকের ভিতরে জমাট ব্যথা গড়িয়ে পড়ে তার দু'চোখে।

এই মুহূর্তে নূরীকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না, একটু পূর্বে এই নূরীই বনহুরের পাশে উচ্ছল তরঙ্গের মতই চঞ্চলভাবে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিলো, হাসি-গানে ভরিয়ে তুলেছিলো বনহুরকে।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে নাসরিন নূরীর অশ্রুসিক্ত মুখখানার দিকে।

বনহুর তখন তাজের পিঠে ছুটে চলেছে কান্দাই নগরী অভিমুখে।

শহরের অনতিদূরে অশ্ব রেখে বনহুর নেমে পড়লো।

পথের উপর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো কায়েস।

বনহুর অশ্ব ত্যাগ করে গাড়িতে চেপে বসলো।

কায়েস তাজ নিয়ে ফিরে চললো আস্তানা অভিমুখে।

বনহুর প্রথমে তার শহরের আস্তানায় গেলো, সেখানে সে ড্রেস পাল্টে স্বাভাবিক স্যুট পরে নিলো। ছদ্মবেশের প্রয়োজন এখন তার নেই কারণ নূর তাকে চেনে, পিতা বলে জেনেছে তাকে। নূর জানে, তার আব্বু দূর দেশে কোথাও চাকরি করে, সময় পেলেই আসে সে তাদের দেখতে।

বনহুর যখন চৌধুরীবাড়ি এসে পৌঁছলো তখন সবার আগে ফুলমিয়া তাকে দেখতে পেলো, আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে এলো সে তার পাশে—সর্দার!

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়, বলে সে—চুপ্, সর্দার বলে ডাকবে না, বুঝলে?

তবে কি বলে ডাকবো?

ছোট সাহেব বলে ডাকবে।

বেশ, তাই ডাকবো ছোট সাহেব।

নূর কোথায়?

উপরে দাদী আম্মার ঘরে বসে পড়া মুখস্থ করছে।

তুমি কেমন আছো ফুলমিয়া?

খুব ভাল আছি। এ বাড়ির সবাই আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

. এমন সময় সরকার সাহেব দেখে ফেলেন, আনন্দভরা কণ্ঠে বলে উঠেন— ছোট সাহেব এসেছেন! ছোট সাহেব এসেছেন, নূর, নূর। তোমার আব্বু এসেছেন.....

বনহুর এগিয়ে এসে সরকার সাহেবের হাতে হাত রেখে করমর্দন করে বললো— সরকার সাহেব, ভাল আছেন তো?

হাঁ আছি। আপনি কেমন আছেন ছোট সাহেব?

ভালো।

ততক্ষণে অন্দরবাড়ির মধ্যে বনহুরের আগমনবার্তা পৌঁছে গেছে, নূর আর মরিয়ম বেগম নেমে আসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে।

নূর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বনহুরকে— আব্বু, তুমি এসেছো আব্বু.....

বনহুর পুত্রের চিবুক ধরে নাড়া দেয়, তারপর ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে বলে—হাঁ আব্বু, এসেছি।

অদূরে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন মরিয়ম বেগম বনহুর আর নূরের উচ্ছল আনন্দভরা মুহূর্ত তাঁর হৃদয়ে অনাবিল একটা আনন্দ দান করে। নির্বাক নয়নে তিনি এ দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।

বনহুর নূরকে হাতের উপর তুলে নিয়ে আদর করে, তারপর এগিয়ে এসে মায়ের কদমবুসি করে।

বনহুর মায়ের কদমবুসি করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সিঁড়ির উপর ধাপে নজর চলে যায়, মনিরার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় তার। আজ মনিরা অভিমানে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না, একটি মিষ্টি হাসি দিয়ে স্বামীকে অভিনন্দন জানায়।

বনহুর নূর আর মা সহ উপরে উঠে আসে।

আজ বনহুরের আগমনে চৌধুরীবাড়িতে আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যায়। সরকার সাহেব থেকে বাড়ির মালী পর্যন্ত খুশিতে ডগমগ। মরিয়ম বেগম খোদার কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া করলেন। তিনি রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পুত্রের জন্য নানারকম খাবার নিজ হাতে তৈরি করতে বসে গেছেন।

নূর তো আব্বুকে পেয়ে বসেছে; আর নড়বার লক্ষণ নেই তার মধ্যে। সরকার সাহেব, ফুলমিয়া কত করে ওকে ডেকেছে তবু নূর অচলঅটল। সে ভাবছে, সরে গেলেই তার আব্বু যদি পালিয়ে যায়। এখন নূর পূর্বের মত ছোট্টটি নেই— সে এখন বেশ বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে।

বনহুর কিন্তু মনিরাকে নিবিড় করে পাবার জন্য ভিতরে ভিতরে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, একসময় সুযোগ পেয়ে মনিরাকে ধরে ফেললো সে।

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে জোরপূর্বক নিজকে মুক্ত করে নিয়ে বললো— আমাকে যে কথা দিয়েছিলে স্মরণ আছে তো?

বনহুর মৃদু হেসে বললো— আছে।

বলো তো কি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাকে? মনিরা জানে, তার স্বামী সব ভুলে গেছে, এবং সেই কারণেই এই মুহূর্তে বললো সে কথাটা।

বনহুর কিন্তু সব ভুলে বসে আছে তবু মিছেমিছি বললো সে সব তার মনে আছে।

মনিরা ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো— বলো কি কথা দিয়েছিলে? কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তুমি, বলো?

বনহুর মাথা চুলকায়, ছাত্র যেমন মাষ্টার সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে মুখ কাঁচুমাঁচু করে তেমনি বনহুর মনিরার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ে।

মনিরা বুঝতে পারে, সব বিস্মৃত হয়ে গেছে বনহুর, তাই সে গম্ভীর হবার ভান করে বলে— সব ভুলে গেছো, না?

মোটেই না।

তবে মাথা চুলকাচ্ছো কেন?

লক্ষীটি, স্মরণ করতে দাও।

কি বললে, সব তুমি ভুলে গেছো?

এবার বনহুর মনিরার হাত দু'খানা চেপে ধরে মিনতিভরা স্বরে বললো— আমাকে ক্ষমা করো মনিরা, আমি স্মরণ করতে পারছি না তোমাকে কি কথা দিয়েছিলাম?

এই মন নিয়ে তুমি বিশ্বখ্যাত দস্যুসম্রাট হয়ে.....

বনহুর মনিরার মুখে হাতচাপা দেয়— চুপ্ করো, নূর শুনে ফেলবে....এবার বলো কি কথা?

আবার তুমি শপথ করো, আমার কথা রাখবে?

আমতা আমতা করে বলে বনহুর— কি কথা না শুনে কি করে শপথ করবো, বলো?

তুমি একদিন শপথ করেছিলে.....

আজ বলো, ভেবে দেখি যদি.....

না, যদি নয়, রাখতে হবে; নাহলে আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না আর কোনোদিন। যেতে দেবো না তোমাকে আস্তানায়।

মনিরা!

হাঁ, আমি তোমাকে বন্দী করে রাখবো।

সর্বনাশ, বন্দী! হাত জোড় করে বনহুর মনিরার সম্মুখে— ক্ষমা করো মনিরা!

না, ক্ষমা আমি করবো না। তুমি কথা দিয়েছিলে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারী হবে।

ওঃ এই কথা! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—হাঁ, সংসারী হবো এবার।

হবো নয়, হতে হবে।

হাঁ, আমি সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলাম মনিরা।

তা ভুলবে না? তোমার মত একজন গুণবান মানুষের মনে থাকা কিছুই সম্ভব নয়। যাক্, বলো এতোদিন কেন আসোনি?

আমি বলেছি, ঐ প্রশ্ন তুমি আমাকে করো না মনিরা। কারণ আমি তোমাকে সঠিক কোনো জবাব দিতে পারবো না। তা'ছাড়া তুমি তো জানোই কেন আমি আসতে পারি না। যাক্ ও সব কথা, বলো কিভাবে আমি সংসারী হতে পারি?

বনহুর মনিরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো তার মুখে।

মনিরা স্বামীর চুলে ধীরে ধীরে আংগুল চালাতে লাগলো, আজকের এ পরিবেশে কতদিন স্বামীকে পায়নি সে। অতৃপ্ত নয়নে মনিরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

মনিরা বললো একসময়— সত্যিই তুমি সংসারী হবে তো?

বিশ্বাস করো, এবার সংসারী হবো।

মনিরা আনন্দে দু'চোখ বন্ধ করে বললো— আমার সাধনা তাহলে স্বার্থক হবে।

বনহুর মনিরার দীপ্ত উজ্জ্বল সুন্দর মুখে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, সত্যিই কি সে মনিরাকে সুখী করতে সক্ষম হবে? সত্যি কি সে

পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের মত সংসারী হতে পারবে? যেমন করে হোক, তার শপথ রক্ষা করতেই হবে, দস্যুতা ছেড়ে দেবে সে এবার.....

বনহুর ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায়।

মনিরা বলে উঠে— কি ভাবছো শুনি?

উঁ, কি ভাবছি.....

হাঁ, বলো তুমি কি ভাবছিলে?

ভাবছিলাম, এবার সংসারী হবো, দস্যুতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করবো। উঠে বসলো বনহুর সোজা হয়ে, বললো আবার— সরকার সাহেবকে ডাকো দেখি, কথা আছে তার সঙ্গে।

মনিরা বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো সরকার সাহেবসহ।

সরকার সাহেব কক্ষে প্রবেশ করে বললেন— ছোট সাহেব, আমাকে ডেকেছেন?

হাঁ বসুন। মনিরা, তুমি আম্মাকে ডেকে আনো একবার।

সরকার সাহেব একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

মনিরা মামীমা সহকারে এলো।

মরিয়ম বেগম নিজ হাতে রান্নাবান্না করছিলেন— তিনি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন পুত্রের সম্মুখে।

বনহুর মাকে লক্ষ্য করে বললো— বসো মা। আমার পাশে এখানে বসো।

মরিয়ম বেগম পুত্রের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন।

মনিরাও বসলো। সে ভাবছে, না জানি তার স্বামী কি বলবে, কেনই বা ডেকেছে সে ওদের।

বনহুর বললো— মা, আমি তোমার কথা রাখবো। তুমি একদিন বলেছিলে— মনির, তুই সংসারী হ'। আমি এতোদিন তোমার কথা রাখতে পারিনি, এবার সংসারী হবো।

বনহুরের কথায় খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মরিয়ম বেগমের মুখমন্ডল।

সরকার সাহেবের চোখেমুখে ফুটে উঠলো একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস।

মনিরার অন্তরে খুশির উৎস বয়ে চলেছে— তার স্বামীকে এখন থেকে নিবিড় করে পাবে সে সর্বক্ষণের জন্য। নারীর স্বামীই যে সব কিছু, মনিরা অনাবিল আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো।

বনহুর বললো—সরকার সাহেব, আপনি শহরের মধ্যে আমার জন্য একটি বাড়ি খোঁজ করুন।

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে বললেন—বাড়ি! বাড়ি কি হবে মনির? এ বাড়ি কি হলো?

তা হয় না মা। তুমি তো জানো, এ বাড়ি আমার জন্য নিরাপদ স্থান নয়। সর্বক্ষণ এ বাড়ির আনাচে-কানাচে পুলিশ শ্যেনপাখীর মতই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কাজেই আমাকে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে শহরে বাস করতে হবে।

সরকার সাহেব বললেন—হাঁ বেগম সাহেবা, মনিরের জন্য ভিন্ন বাড়ির একান্ত প্রয়োজন। এ বাড়ি তার জন্য কোনো সময়ই সমীচীন নয়। তাছাড়া আশেপাশে নিকটেও তার থাকা চলবে না।

ঠিক বলেছেন সরকার সাহেব, আপনি শহরের এমন স্থানে আমার জন্য বাড়ি সংগ্রহ করুন যেখানে আমি নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করতে পারবো। টাকার জন্য ভাববেন না, যত টাকা লাগে দেবো।

❑

বনহুরের কথামত সরকার সাহেব একটি সুন্দর বাড়ির সন্ধানে রইলেন। চললো তাঁর বাড়ি খোঁজা।

পেয়েও গেলেন তিনি একটা মনের মত বাড়ি।

শহরের সেরা জায়গা গুলবাগ, সেখানে একটি অতি সুন্দর বাড়ি তাড়া পেলেন সরকার সাহেব। মস্তবড় বাড়ি। প্রায় দু'বিঘা নিয়ে বাড়িখানা। বাড়ির চারপাশে খোলা জায়গা। সম্মুখে ফুলের বাগান। পাশেই একটি সুন্দর পুকুর। পুকুরে পদ্মফুলের থোকা নীল সচ্ছ জলে দোল খাচ্ছে।

সরকার সাহেবের মনের মত হয়েছে বাড়িটা, যদিও দাম অত্যন্ত বেশি।

বাড়িখানা সরকার সাহেব মনিরের জন্য সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে একেবারে তৈরি করে রাখলেন।

মনিরা প্রতীক্ষা করতে লাগলো, আবার কবে আসবে মনির কে জানে। নতুন বাড়িতে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো সে। নূরের আনন্দ আর ধরছে না, এখন থেকে সে আব্বুকে পাবে সর্বক্ষণ পাশে।

যেদিন থেকে নূর তার আব্বুকে খুঁজে পেয়েছে সেদিন থেকে তার কচি মনে অনাবিল একটা আনন্দ ফুলঝুরির মত ঝরে পড়ছে। সব সময় নূর আব্বুর জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে—কখনও আম্মাকে কখনও দাদীআম্মাকে কখনও বা সরকার সাহেব আর ফুলমিয়াকে ব্যস্তসমস্ত করে তোলে—বলো আমার আব্বু কখন আসবে? বলো আমার আব্বু কখন আসবে?

কেউ বলে, কাল আসবে। কেউ বা বলে, আজ। নূরের এসব কথায় প্রাণ ভরে না। দাদীআম্মার কথা বিশ্বাস হয়, দাদী আম্মা বলেছেন—নূর, তোর আব্বু আমার ছেলে, আজ না এলে কাল আসবে, কাল না এলে পরশু আসবে, আসবেই একদিন। দাদু, তুমি আব্বুকে এবার কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, কেমন?

নূর ভাবে, সত্যিই সে এবার আব্বুকে ধরে রাখবে, যেতে দেবে না সে কিছুতেই। তাই মাথা নেড়ে দাদীআম্মার কথায় সায় দেয়।

নূরের বাসনা পূর্ণ হলো। পিতাকে সে পেলো এবার একান্ত পাশে। আনন্দ উচ্ছ্বাস ভরপুর ওর কচি মন, সর্বক্ষণ আব্বুর কাছে থাকে সে। একদন্ড খেলা করতেও যায় না নূর, হঠাৎ যদি আবার পালিয়ে যায় তার আব্বু।

ছেলের ব্যাপার দেখে হাসে বনহুর।

মনিরা বলে—কি, হাসছো যে বড়?

হাসবো না? তোমার ছেলের কান্ড দেখে না হেসে পারছি না মনিরা, সব সময় আমাকে কাছে কাছে ধরে রাখতে চায়---

ও বুদ্ধিমান, জানে যদি পালিয়ে যাও।

মা আর ছেলের একরকম বুদ্ধি দেখছি।

মনিরা স্বামীর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—দেখো অবুঝ ছেলে তবু তার আব্বুকে পেয়ে কত খুশি! আর তুমিই পারলে না আজও স্ত্রী-

পুত্রকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে। কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মনিরা।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলে—মনিরা এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কে বলে আমি তোমাদের সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিনি?

আমার মন বলে। গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে মনিরা।

তোমার মন নিশ্চয়ই তোমাকে ধোকার মধ্যে ফেলেছে। মনিরা, তুমি জানো না, আমার জীবনে তোমরা প্রেরণার উৎস। সত্যি, মাঝে মাঝে আমি একেবারে হতাশায় ভেংগে পড়ি, তখন তোমাদের পাশে এসে দাঁড়ালে অনাবিল একটা আনন্দে ভরে উঠে আমার প্রাণ। মনিরা, আমি চাই তুমি কোনোদিন আমার উপর বিশ্বাস হারাবে না।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখলো। কোনো কথা সে মুখে না বললেও তার মন বললো, না গো না, তোমাকে কোনোদিন আমি অবিশ্বাস করবো না।

বনহুর স্ত্রীর মুখখানা তুলে ধরলো নিজের মুখের কাছে।

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করে বললো —ছিঃ নূর কাছেই আছে, দেখে ফেলবে যে!

বনহুর স্ত্রীকে মুক্ত করে দেয়।

❑

কয়েক দিন বেশ ভালই কাটলো, দস্যু বনহুর বনে গেছে নাগরিক মনির চৌধুরী। স্ত্রী-পুত্র, চাকর-বাকর নিয়ে সুন্দর সংসার কিন্তু এতো সুখ কি আর বনহুরের সইবে!

হঠাৎ একদিন ছদ্মবেশে রহমান এসে পড়ে সেখানে। দাঁড়ি গোফ সাদা, মাথায় একরাশ পাকা চুল, গলায় পাথরের মালা। বৃদ্ধ দরবেশের সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছে আজ সে সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে।

মনিরার কড়া নিষেধ, বাইরের কোনো লোক যেন গেটের এ পাশে না আসতে পারে, যতক্ষণ না তারা ভিতরে প্রবেশের সম্মতি দান করে। মনিরার

ভয় দস্যু স্বামী নিয়ে, কখন কে কোন্‌ভাবে আসবে, কোন্ অভিসন্ধি নিয়ে তাই বা কে জানে! এমন কি পুলিশের লোকও তো আসতে পারে।

রহমান যখন বৃদ্ধ দরবেশের সাজে সজ্জিত হয়ে গেটের পাশে এসে দাঁড়ালো তখন দারওয়ান লাঠি উঁচিয়ে বললো—খবরদার, এক পাও মত আনা। এহি লাঠিমে মাথা তোমহারা ঠাণ্ডা করদেঙ্গে---

রহমান ক্ষণিকের জন্য ভড়কে যায়, সে স্বাভাবিক ড্রেসে আসতে পারতো কিন্তু যে নতুন দারওয়ান এবং চাকর-বাকর আছে তারা কেউ তাকে চেনে না। তাছাড়া রহমানকে মনিরা নিজেও মানা করে দিয়েছে, এ বাড়িতে তারা যেন না আসে এবং সর্দারকে দস্যুতায় উৎসাহ না দেয়।

মনিরা রহমান এবং কায়েসকে চিনতো, ভালোও বাসতো স্বামীর অনুচর বলে। কিন্তু এখন সে চায় না, তারা আসে বা তার স্বামীকে আস্তানায় নিয়ে যায়। এসব নানা কারণে রহমান আজ ছদ্মবেশে এসেছে সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা না করলেই নয়। কান্দাই-এর অদূরে মরিলা দ্বীপে এক ভয়ঙ্কর কাপালিকের আবির্ভাব ঘটেছে। অতি ভয়ঙ্কর সে সন্ন্যাসী কাপালিক, যে প্রতিদিন সাতটি করে নরহত্যা করে এবং সেই নরমুণ্ডগুলোর রক্ত পান করে। প্রতিদিন বহু লোক এই কাপালিকের হাতে জীবন বিনাশ করে চলেছে। শুধু মরিলা দ্বীপই নয়, দ্বীপের আশে পাশে যেসব শহর-বন্দর-নগর রয়েছে, প্রতিদিন এই সব জায়গা থেকে লোক চুরি হয়ে যাচ্ছে। একটি দুটি নয়, শত শত লোক হারিয়ে যাচ্ছে এসব জায়গায় থেকে।

ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন থেকেই চলেছিলো। কিন্তু তেমন করে কারো কানে পৌঁছায়নি। বিশেষ করে বনহুরের আস্তানায় পৌঁছতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে।

ঘটনাটা যখন শহরে-বন্দরে এখানে-সেখানে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে তখন রহমান আর চুপ থাকতে পারেনি, সে নিজে গিয়েছিলো মরিলা দ্বীপে, যদি সর্দারকে না জানিয়ে এর কোনো প্রতিকার করতে পারে, এই আশায়।

কিন্তু রহমান বিফল হয়েছে। মরিলা দ্বীপই শুধু নয়, মরিলা দ্বীপের আশেপাশে যেসব শহর-বন্দর আছে সেগুলোতে খোঁজ নিয়ে হতভম্ব

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। সে নিজের চোখে দেখেছে রাজপথের বুকে পড়ে আছে রক্তমাখা মুন্ডহীন দেহ।

অনেক সন্ধান করেও কেউ জানতে পারেনি বা দেখেনি, কে কখন এইসব অসহায় লোকগুলোর এমন অবস্থা করেছে।

তবে লোকমুখে প্রচার শুনেছে, এক ভয়ঙ্কর কাপালিকের আবির্ভাব ঘটেছে যে সকলের অলক্ষ্যে নরহত্যা করে যাচ্ছে, অথচ কেউ তাকে ধরতে পারছে না বা দেখতে পাচ্ছে না।

একদিন নয়, কয়েক সপ্তাহ ধরে রহমান, কায়েস ও আরও কয়েক জন মিলে এই নরহত্যাকারী কাপালিকের অনুসন্ধান চালিয়েছে কিন্তু তাকে খুঁজে বের করা দূরের কথা—কোথায় থাকে, কিভাবে সে এতোগুলো পথচারীর মধ্য একজনকে হত্যা করে মস্তক নিয়ে যায়, এই রহস্য তারা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

বরং তাদের দলের একজনকে হারিয়েছে রহমান। তার মস্তক বিহীন দেহটা যেদিন পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলো সেইদিন রহমান মরিলা দ্বীপ ত্যাগ করে চলে এসেছে। দুঃখ-ব্যথায় মন তার ভরে গিয়েছিলো, আহা, বেচারী শহীদ কেমন করে প্রাণ হারালো। তখন রহমান ফিরে এসেছিলো আস্তানায়।

ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করেছিলো সেদিন রহমানের, কারণ শহীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী সে। মরিলা দ্বীপে একটা হোটেলে উঠেছিলো রহমান তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। ভেবেছিলো, সর্দারকে না জানিয়েই যদি এই ভয়ঙ্কর কাপালিক যমদূতটাকে নিঃশেষ করে দ্বীপবাসী এবং অন্যান্য নগরবাসীর জীবন রক্ষা করতে পারে তাহলে ভালোই হয়। এই সামান্য ব্যাপারে সর্দারকে খাটাতে চায় না সে। তাছাড়া সর্দারকে নাগরিক হিসাবে দেখলে মন তার উৎফুল্ল হয়ে উঠে, আনন্দে ভরে উঠে তার হৃদয়। সর্দারের জন্য রহমান এতো প্রফুল্ল নয়, মনিরার খুশিতে তার এতো আনন্দ।

রহমান আজ বাধ্য হয়েই এসেছে, যতক্ষণ সে নিজে পেরেছিলো ততক্ষণ সর্দারকে সে একথা জানাতে চায়নি, শেষ অবধি পারলো না আর চুপ থাকতে। এই কয়েক সপ্তাহে বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে সেই জঘন্য কাপালিকের হাতে।

রহমান যখন দরবেশ বাবাজীর বেশে ফটকের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো তখন দারওয়ান তেড়ে এলো মারতে।

রহমান প্রথমে ভড়কে গেলো কিন্তু পরক্ষণে সামলে নিয়ে বললো—বাবা, একটু পানি খাওয়াবে? একটু পানি----

দারওয়ান আরও জোরে খেঁকিয়ে উঠলো—আরে ভাগ্ ভাগ্। পানি পিউগি তব বাহারমে বহুৎ পানিকে কল হ্যায় পি লেও।

রহমান হতাশ হলো এবার কিন্তু ফিরে গেলে তার চলবে না, যেমন করে হোক সর্দারের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

দরবেশ বাবাজী তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে দারওয়ান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো, লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে এলো—আরে যাও না বাবা, হিয়া কাহেকো খাঁড়া?

রহমান নিরাশ দৃষ্টি মেলে তাকায় ফটকের ভিতর দিয়ে বাগান বাড়ির দিকে। এই মুহূর্তে সর্দার যদি একবার বাইরে এসে পড়তো তবু হতো, যা হোক করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতো তার। হায় হায়, বৌরাণী এবার কি কড়া শাসনের ব্যবস্থা করেছে। রহমানের হাসিও পায়, দুঃখও হয়। দস্যুসর্দার এবার আসল বন্দী হয়েছে।

রহমানের মনের কথা মিথ্যা নয়, মনিরা এবার খুব করে বুদ্ধি-কৌশল এঁটেছে। দস্যুস্বামীকে সে নাগরিক বানাতে চায়। বনের সিংহকে যেমন খাঁচায় আবদ্ধ করে তেমনি পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা অন্তপুরে আবদ্ধ করেছে মনিরা স্বামীকে। যেন সে কোনোক্রমে পালাতে না পারে। এ জন্য সদাসর্বদা কড়া নজর রেখেছে সে। বাইরের কারো প্রবেশ নিষেধ এ বাড়িতে।

খাঁচায় বন্দী হয়ে বনের সিংহ যেমন ছটফট করতে থাকে কিন্তু কিছু বলতে পারে না, তেমনি অবস্থা হয়েছে বনহুরের। তার আস্তানা, সঙ্গী-সাথী আর নূরীকে ছেড়ে যদিও খুব খারাপ লাগছিলো তবু সে নীরব ছিলো মনিরার ভয়ে।

মনিরা স্বামীকে সর্বক্ষণ তার চিন্তা থেকে বিরত রাখার জন্য নানাভাবে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। সব সময় পাশে পাশে থাকে সে, যদিও কোনো

সময়ের জন্য সরে যায় তখন মনিরা নূরকে ভালোভাবে সতর্ক করে দেয়, যেন তার আব্বা সরে যেতে না পারে।

মনিরার কান্ড দেখে হাসে বনহুর। পুলিশ যাকে হাঙ্গেরী কারাগারে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি, লৌহশিকলে যাকে বেঁধে রাখতে পারেনি পুলিশ সুপার জাফরী, আর তাকেই কিনা নজর বন্দী করে রেখেছে মনিরা।

আজ ক'দিন থেকে বনহুরের মনটা ছটফট করছিলো, সেকি আর নিরিবিলি চুপচাপ বসে থাকার মানুষ!

বনহুর দোতলার ছাদে পায়চারী করছিলো আর ভাবছিলো তার আস্তানার কথা। মনিরা অদূরে একটা সোফায় বসে সোয়েটার বুনছিলো তার মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলো—লক্ষ করছিলো সে স্বামীকে। স্বামীর মনে যে কোনো একটা গভীর চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো তা বেশ বুঝতে পারছিলো সে।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় ফটকের দিকে।

দারওয়ান আর দরবেশ বাবাজীর মধ্যে তখন কথা কাটাকাটি চলছে।

বনহুর আচমকা পায়চারী বন্ধ করে থেমে পড়লো, তাকালো সে দরবেশ বাবাজী আর দারওয়ানের দিকে।

অকস্মাৎ স্বামীকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেখে মনিরা সোয়েটারের কাঁটা হাতে উঠে আসে, স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকায় মনিরা সম্মুখে, যেদিকে বনহুর তাকিয়েছিলো।

দরবেশ বাবাজীর দিকে তাকিয়ে বলে বনহুর, মনিরা, দেখো দেখো, একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ দররেশ বাবা এসেছেন।

মনিরার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠে, বলে মনিরা—দেখেছি।

বনহুর বলে উঠে—চলো দেখি কি চায় বেচারী!

শক্তকণ্ঠে বলে মনিরা—তোমাকে আর দেখতে হবে না।

বনহুর আমতা আমতা করে বলে—হয়তো কিছু চায় সে। দেখছো না আমাদের দিকে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

দেখেছি। যা দিতে হয় আমি নিজে গিয়ে শুনে দিয়ে আসছি। তোমাকে সেজন্য মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি বসো ঐ সোফায় গিয়ে।

বনহুর অগত্যা বাধ্য ছাত্রের মত স্ত্রীর আদেশ পালন করলো।

মনিরা নেমে গেলো নিচে।

এগিয়ে আসতেই রহমান হকচকিয়ে গেলো, এবার বুঝি তার সব কারসাজি ফাঁস হয়ে যাবে বৌরাণীর কাছে। ভয়ঙ্করভাবে জব্দ হবে সে। কারণ বৌরাণী তাকে মানা করে দিয়েছে, আস্তানার কোনো খবর নিয়ে যেন সে না আসে। এলে কিন্তু ক্ষমা করবে না সে কিছুতেই। নিজে সে পুলিশ ডাকিয়ে ধরিয়ে দেবে। এমন কি ওয়্যারলেসটাও সরিয়ে ফেলেছে মনিরা আস্তানায় যোগাযোগের ভয়ে।

রহমান মনিরাকে আসতে দেখে পালাবে না থাকবে ভাবছে, তখন দারওয়ান রহমানের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে—মেম সাহেব আতা, তুম ভাগনে মাঙ্গতো না, নেহি ছোড়েঙ্গা তুমকো--

রহমান ঢোক গিলে বলে—মেম সাহেবকে দেখে পালাবো কেন বাবা, বরং তাকে দোয়া করে যাবো। দোয়া করে যাবো।

ততক্ষণে মনিরা এসে দাঁড়িয়েছে ফটকের পাশে, তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখে নিলো দরবেশ বাবাজীর আপাদমস্তক।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে তখন রহমান—সর্বনাশ, এই বুঝি তাকে চিনে ফেলে, তাহলেই হয়েছে—বৌরাণীর কাছে বিশ্বাস হারাবে সে চিরদিনের জন্য। কারণ রহমান মনিরার কাছে শপথ করেছিলো—অবশ্য বাধ্য হয়েই বলেছিলো রহমান—আমি শপথ করছি বৌরাণী, সর্দারের কাছে আর আসবো না। আজ এসেছে রহমান শপথ ভঙ্গ করে, শত শত জনগণের জীবন রক্ষার্থে সর্দারের সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় সে খুঁজে পায়নি।

মনিরা বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে দরবেশ বাবাজীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—কি চাও দরবেশ বাবা?

এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো রহমান, বুকের মধ্যে যেন ওর হাতুড়ির ঘা পড়ছিলো। দস্যু বনহুরের পার্শ্ব অনুচর হয়ে একটা নারীর কাছে দুর্বল নাচারের মত, অপরাধীর মত কাবু হয়ে পড়েছিলো সে। মনিরা যখন বললো—কি চাও দরবেশ বাবা? রহমানের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেন আবার তখন চলতে শুরু করলো। গলার স্বর যতদূর সম্ভব পাল্টে নিয়ে বললো—মা, আপনার অসীম দয়া—আমি বৃদ্ধা দরবেশ, একটু ঠান্ডা পানি পান করতে চাই।

মনিরা কোমল স্বরে বললো—কতদূর থেকে তুমি ঠান্ডা পানি পান করতে এসেছো বাবাজী?

হঠাৎ মনিরার এ প্রশ্নে ভড়কে গেলো রহমান মুহূর্তের জন্য। কারণ মনিরার প্রশ্নটা স্বাভাবিক হলেও সচ্ছ ছিলো না। কেমন যেন একটু সন্দেহের ছোঁয়াচ ছিলো মনিরার গলার স্বরে। রহমান নিজের দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—বহু দূর থেকেই আমি এসেছি মা। তবে ঠান্ডা পানি খাবার জন্যই আসিনি--

আমি জানি, তুমি কেন এসেছো দরবেশ বাবাজী।

সঙ্গে সঙ্গে রহমানের মুখমন্ডল বিবর্ণ হলো। পালাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো সে এবার।

মনিরা হেসে বলে উঠলো—ঠান্ডা পানি পানের আশায় আসেননি, এসেছেন মনের আকর্ষণে, তাই না দরবেশ বাবাজী?

রহমান মাথা নিচু করে রইলো, কোনো জবাব সে দিলো না বা দেবার সাহস পেলো না। রহমান স্পষ্ট বুঝতে পারলো, বৌরাণী তাকে চিনতে পেরেছে এবং সেইজন্য জব্দ করছে সে তাকে।

মনিরা এবার দারওয়ানকে লক্ষ্য করে বললো—একে অন্তপুরে নিয়ে যত্ন সহকরে বসতে দাও এবং ভাল খাবার আর ঠান্ডা পানি দাও।

এবার রহমান মরিয়া হয়ে উঠলো, বৌরাণী তাকে এইভাবে জব্দ করবেন ভাবতে পারেনি সে। বাধ্য হয়েই রহমান দারওয়ানকে অনুসরণ করলো।

মনিরা চলে গেলো উপরে।

বনহুর তখন সোফায় বসে আপন মনে সিগারেট পান করছিলো।

মনিরা এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

বনহুর বললো—দরবেশ বাবা গেছে?

না।

তবে কি চায় সে?

ঠান্ডা পানি।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর —ঠান্ডা পানি পান করতেই---

হাঁ, ঠান্ডা পানি পান করতেই এসেছিলো সে।

দিয়েছো?

না।

পানি পান করতে দাওনি?

শুধু পানি নয়, সরবৎ এবং খানাও দেবো বলে অন্তপুরে এনেছি।

তুমি দেখছি--

হাঁ, তোমার চেয়েও চালাক মনে রেখো।

এতে আবার চালাক-অচালাকের কি এলো?

চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মত বসে থাকো, আমি এক্ষুণি আস্‌ছি। চলে যায় মনিরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে।

বনহুরের মুখে এক টুকরা হাসি ফুটে উঠে, পুনরায় আর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে সোফায় দেহটা এলিয়ে দেয়।

মনিরা বয়ের হাতে খাবারের থালা আর নিজের হাতে ঠান্ডা পানি নিয়ে হাজির হয় দরবেশ বাবাজীর সম্মুখে।

দরবেশ বাবা মাথা নিচু করে বসে ছিলো, পদশব্দে মুখ তুলে তাকায়।

মনিরা বয়ের হাত থেকে খাবারের থালা নিয়ে এবং পানির গেলাসটা দরবেশের সম্মুখে রেখে পাশে বসে—খাও বাবা।

রহমান বাধ্য হয়ে খেতে শুরু করে।

মনিরা বলে—দরবেশ বাবা, একটা কথা বলবো, দয়া করে শুনবে?

হাঁ মা, শুনবো। খেতে খেতে বলে দরবেশ বাবা।

এক সময় খাওয়া শেষ হয়, এখন অনেকটা ভয় কেটে গেছে রহমানের। বৌরাণী ঠিক তাকে চিনতে পারেননি তাহলে। প্রতীক্ষা করে কি বলতে চান তাদের বৌরাণী।

মনিরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসে, বলে সে—দরবেশ বাবাজী, আমার স্বামী মোটেই সংসারী নয়, তাকে আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারি না। তুমি যদি দয়া করে... ...

রহমানের মুখ খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠে, এতোক্ষণ বুকের মধ্যে তার যে একটা ভীষণ ঝড় বইছিলো তা শান্ত হয়ে আসে। বলে সে—হাঁ মা, ঠিক আমি ধরেছি তোমার মনের কথা। সত্যি তুমি স্বামীভাগ্যা নারী কিন্তু ঐ একটা ব্যাপারে তুমি সুখী নও। দেখি মা তোমার দক্ষিণ হাতখানা?

মনিরা তার দক্ষিণ হাতখানা মেলে ধরলো দরবেশ বাবার সম্মুখে।

দরবেশ-বেশী রহমান মনিরার হাত স্পর্শ করার সাহসী হলো না, সে হাতখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললো— মা, তুমি বড়ই ভাগ্যবতী নারী। তোমার একমাত্র পুত্র ভবিষ্যতে মস্তবড় নামকরা একজন ব্যক্তি হবে। যেমন তোমার স্বামী বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি.....

মনিরা চট করে হাতখানা সরিয়ে নিলো।

রহমান বুঝতে পারলো, মনিরা ভয় পেয়েছে কারণ তার হাতের রেখায় যদি ধরা পড়ে যায় তার স্বামী বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ দস্যু।

মনিরা হাত সরিয়ে নিতেই দরবেশ বলে উঠলো— আমি তোমাকে একটা তাবিজ দেবো মা। তুমি ঐ তাবিজখানা তোমার স্বামীর হাতের কব্জায় বেঁধে দেবে। তারপর দেখবে সে কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে দূরে থাকবে না।

হাত পাতলো মনিরা— কই দাও।

দরবেশ তার ঝোলার মধ্য হতে বের করে আনলো একটা তাবিজ, বেশ বড় তাবিজটা। মনিরার হাতে দিয়ে বললো— এই নাও। কিন্তু খবরদার, এ তাবিজের গুণাগুণ তোমার স্বামী যেন জানতে না পারে! জানলে অমঙ্গল হবে।

মনিরা ঘাড় কাৎ করে বললো— আচ্ছা, সে জানবে না।

রহমান এবার নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো, মনিরাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলো সে। অনেক কষ্টে কার্যোদ্ধার হলো তার।

দরবেশ চলে যেতেই মনিরা তাবিজটা হাতের মুঠায় লুকিয়ে পা টিপে টিপে স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়ালো। বনহুর কিন্তু ঘুমের ভান করে চোখ দুটো বন্ধ করে ছিলো। মনিরা আর দরবেশের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছিলো তখন বনহুর তাদের অলক্ষ্যে আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং শুনেছিলো সব কথা ওদের। মনিরা ফিরে আসবার পূর্বেই বনহুর তার স্বস্থানে এসে সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমের ভান করে রইলো।

মনিরা স্বামীকে সত্যি সত্যি নিদ্রিত ভেবে অতি সতর্কতার সঙ্গে তাবিজখানা সূতায় বেঁধে পরিয়ে দিলো স্বামীর বাজুতে। তারপর ডাক দিলো— শুনেছো, ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?

ঘুম থেকে জেগে উঠার মতই চোখ মেলে বনহুর সোজা হয়ে বসে বলে—মাফ করো মনিরা, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তা এতোক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?

দরবেশ বাবাজীর কাছে।

সর্বনাশ! এতোক্ষণ কি করছিলে সেখানে?

একটা তাবিজ নিলাম।

আশ্চর্য হবার ভান করে বলে বনহুর— তাবিজ!

হাঁ, একটা তাবিজ নিয়েছি।

কিন্তু কি করবে তাবিজ দিয়ে?

তোমার জন্যই তো তাবিজ নিলাম।

আমার জন্য?

হাঁ।

তার মানে?

মানে তুমি কত জায়গায় যাও, কত সময় কতরকম বিপদে পড়ো তাই ঐ তাবিজ দিলেন দরবেশ বাবা। ওটা তোমার হাতের বাজুতে বাঁধা থাকলে বিপদ তোমার কাছে আসবে না, বুঝলে?

বুঝলাম? কিন্তু কোথায় তোমার সেই তাবিজ বলো তো?

তোমার বাজুতে বেঁধে দিয়েছি।

চমৎকার! গম্ভীর হয়ে কথাটা বললো বনহুর।

মনিরা হেসে বললো— কেন, মন্দ কি হয়েছে বলো?

আচ্ছা, এতোবড় একটা তাবিজ আমি হাতে বেঁধে ঘুরে বেড়াবো, লোকে বলবে কি বলো তো?

লক্ষ্মীটি, লোকে কিছু বলবে না। তা ছাড়া জামার নিচে পরা থাকবে, দেখবেই বা কি করে অন্যে?

বনহুর নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। একটা স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের ফাঁকে।

মনিরার আনন্দ আর ধরে না, স্বামীকে সে এবার তাবিজের জোরে সব সময় কাছে পাবে।

❑

গভীর রাত।

সমস্ত বাড়িখানা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

পাশের খাটে নূর ও মনিরা ঘুমাচ্ছে। নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে ওদের। বনহুর তার বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

অতি সন্তর্পণে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলো। কক্ষমধ্যে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে নিলো এবার সে। চারিদিকের জানালাগুলি অতি সাবধানে বন্ধ করে দিলো তারপর মেঝের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। খুলে ফেললো বাজু থেকে তাবিজটা।

বনহুর তাবিজটা খুলে হাতের মুঠায় নিয়ে একপাশে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে তাবিজের ঢাকনা খুলে গিয়ে বেরিয়ে এলো ক্ষুদে একটা ওয়্যারলেস।

বনহুর মুখের কাছে তুলে ধরেই ডাকলো— রহমান... হ্যালো রহমান...

অল্পক্ষণেই রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ হলো বনহুরের, কথা শুরু হলো উভয়ের মধ্যে।

বললো বনহুর— কি সংবাদ নিয়ে তুমি তখন এসেছিলে রহমান?

ওপাশ থেকে শোনা যায় রহমানের গলা— সর্দার, একটা দুঃসংবাদ নিয়েই আমি তখন হাজির হয়েছিলাম।

বুঝতে পেরেছিলাম, বিনা কারণে তুমি আসোনি। তা বলো কি সেই দুঃসংবাদ?

সর্দার, মরিলা দ্বীপে এক ভয়ঙ্কর কাপালিকের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রতিদিন সে বহু লোককে হত্যা করে রক্ত পান করে। শুধু মরিলা দ্বীপই নয়, আশেপাশে অনেক শহর-বন্দরের লোককেও সে হত্যা করে চলেছে....

বলো কি রহমান?

হাঁ সর্দার, আপনাকে না জানিয়ে আমি, কায়েস এবং আরও কয়েকজন মিলে গিয়েছিলাম মরিলা দ্বীপে কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। অনেক সন্ধান করেও এই ভয়ঙ্কর কাপালিকটাকে খুঁজে পাইনি। সর্দার, সেখানে আমাদের একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

দুর্ঘটনা ঘটে গেছে!

আমাদের একজনকেও কাপালিক হত্যা করেছে।

এতোবড় একটা ঘটনা জানাওনি কেন এতোদিন?

সর্দার, সুযোগ হয়নি। বিশেষ করে বৌরাণীর সূতীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে আপনার নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হইনি।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে বনহুর— আমাদের মধ্যে কে নিহত হয়েছে তার নাম বলো?

সর্দার, আমাদের বিশ্বস্ত অনুচর শহীদ খান নিহত হয়েছে। তার মস্তকহীন দেহটা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। আস্তানায় নিয়ে এসে সমাধিস্থ করেছি।

আমি আজই আসছি। তুমি তাজ আর দুলকী নিয়ে ভোরের দিকে হাজির হও....

না। আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

চমকে ফিরে তাকায় বনহুর, কখন যে মনিরা তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো, একটুও টের পায়নি বনহুর। স্ত্রীকে দেখে মুহূর্তের জন্য একটু ভড়কে গেলেও সামলে নিলো সে। সঙ্গে সঙ্গে বললো— সব তো শুনলে মনিরা, বলো এই অবস্থায় আমি কেমন করে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারি?

মনিরা তখন রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, বারবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে সে বনহুরের হাতের মুঠায় সেই তাবিজখানার দিকে, যে তাবিজখানাকে বিশ্বাস করে সে নিজ হস্তে বেঁধে দিয়েছিলো স্বামীর হাতে। দরবেশ যে ছদ্মবেশী রহমান, এতোক্ষণে ফাঁস হয়ে গেছে তার কাছে। অধর দংশন করে মনিরা, স্বামীর হাতের মুঠা থেকে তাবিজ আকারে ওয়্যারলেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে বলে— দাও, ওটা আমি ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলবো। ওটার জন্য আবার আমি তোমাকে হারাবো....

মনিরার কথা শুনে এবং তাবিজটার প্রতি ভয়ানক রাগ দেখে হাসে বনহুর, বলে সে— মনিরা, লক্ষ্মীটি, শোনো, তুমি যা চেয়েছো তাই পাবে। আমি ঠিক সংসারী হয়েছি.....

তাহলে আবার চলে যাবে কেন?

না গিয়ে এখন যে কোনো উপায় নেই মনিরা। কোনো এক কাপালিক প্রতিদিন শত শত লোকের জীবন নাশ করে চলেছে। যদি তাদের বাঁচাতে পারি....

তা হবে না। ওদের বাঁচাতে গিয়ে তুমিই যদি বিপদে পড়ো তখন কি হবে?

মনিরা, তোমাদের দোয়া আমার রক্ষাকবচ। যত বিপদেই পড়ি, অসীম করুণাময় আমাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করে নেন। তুমি আমাকে ছুটি দাও মনিরা.... বনহুর মনিরার হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে।

মনিরা নিরুপায়, স্বামীর কাতর কণ্ঠস্বর তার কাছে বড় করুণ লাগে। কঠিন হতে চাইলেও কঠিন হতে পারে না। মনিরার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে নিজের হাতে ওর চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে...ছিঃ কোঁদো না মনিরা। তোমার চোখে পানি দেখলে আমার মনটা অস্থির হয়ে পড়ে।

মনিরা স্বামীর প্রশস্ত বুকে মুখ লুকিয়ে আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। কিছুতেই সে নিজকে স্থির রাখতে পারে না। ভাবে মনিরা, কত আশা নিয়ে সে চেয়েছিলো স্বামীকে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলবে, কত সাবধানতার সঙ্গেই না সে স্বামীকে নজরে নজরে রেখেছিলো। ভয় ছিলো, না জানি কখন কোন্ ফাঁকে আবার পালিয়ে যাবে সে। কিন্তু সব তার ব্যর্থ হলো, স্বামীকে পারলো না সে ধরে রাখতে, আবদ্ধ রাখতে পারলো না সংসারের গন্ডিসীমার মধ্যে।

ভোর হবার পূর্বেই স্বামীকে বিদায় দিতে হলো মনিরার। রহমান নিজে দুলকীতে চেপে তাজসহ এসেছিলো।

মনিরার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বনহুর। ভোরের আধো অন্ধকারে শুধু শোনা যায় অশ্বখুরের শব্দ খট্ খট্ খট্...

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই নূর পিতার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গোটা বাড়িখানা খুঁজে ফিরে আসে মায়ের পাশে, গম্ভীর ভারী গলায় বলে—আম্মি, আব্বুকে দেখছি না কেন? আব্বু কোথায় বলো না?

মনিরার বুক ফেটে কান্না আসছিলো, পুত্রের প্রশ্নের কোনো জবাব সে দিতে পারছিলো না।

নূর তবু প্রশ্ন করে চলেছে—আম্মি, বলো না আব্বু কোথায়?

বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললো মনিরা— তোমার আব্বু বাইরে গেছেন নূর।

কখন আসবেন আব্বু?

কাজ শেষ হলেই চলে আসবেন।

আম্মি, তুমি না বলেছিলে, আব্বুকে আর যেতে দেবে না?

তা কি হয় বাবা! পুরুষ মানুষকে কোনোদিন ধরে রাখা যায় না।

আমি তো যাইনা আম্মি?

তুমিও যখন তোমার আব্বুর মত হবে তখন তোমাকেও আমি ঘরে আটকে রাখতে পারবো না নূর।

না আম্মি, আমি কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। আব্বুর মত চলে যাবো না দেখো।

আচ্ছা বাবা, তুমি আমার বুক জুড়ে থেকো.... মনিরা পুত্রকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

ওদিকে বনহুর আর রহমান তখন কান্দাই আস্তানায় ফিরে এসেছে।

রহমান আর বনহুর আস্তানার ভিতরে প্রবেশ করতেই ছুটে আসে নূরী— হুর, তুমি এসেছো? ভুলে যায় নূরী রহমানের উপস্থিতি, বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে—সত্যি, এ ক'দিন যে তোমাকে ছাড়া কেমন করে কাটিয়েছি, তুমি বুঝবে না হুর।

রহমান সেই ফাঁকে চলে যায় সেখান থেকে। সর্দার আর নূরীর এই মিলন মুহূর্তে সে নিজকে সরিয়ে রাখে।

বনহুর আর নূরী বিশ্রামকক্ষে এসে দাঁড়ালো।

নূরী অশ্রুসিক্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো— হুর, আমি তোমাকে যেতে দেবো না! কাপালিক তোমাকেও হত্যা করে ফেলবে.....

বনহুর হেসে উঠে খুব জোরে, সে হাসি যেন থামতে চায় না।

নূরী অবাক হয়ে যায় বনহুরের এই অহেতুক হাসি দেখে, ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে নারীজাতি এমনিই হয়। মনটা তাদের এতো দুর্বল যেন তুলোর চেয়েও নরম। একটুতেই ভয়ে মুষড়ে পড়ো তোমরা নূরী।

বনহুর পায়চারী শুরু করলো, তার মনের আকাশে আর একটি অশ্রুসজল মুখ ভেসে উঠছিলো বারবার। বললো আবার বনহুর— তোমাদের চোখের অশ্রু কোনোদিনই বাঁধ সাদতে পারবে না আমার চলার পথে, বুঝলে নূরী! বাধা দিয়ে কোনো ফল হবে না।

হুর! অস্ফুট কণ্ঠে বললো নূরী।

নূরী, আমার কঠিন মনের সঙ্গে তোমার নিজেদের মনকেও কঠিন করে নাও। বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে—

নূরী ঘাড় কাৎ করে বলে— আচ্ছা, আর তোমাকে বাধা দেবো না।

বনহুর নূরীকে টেনে নেয় কাছে।

বাইরে থেকে শোনা যায় রহমানের গলা— সর্দার, সব প্রস্তুত হয়ে গেছে।

বনহুর তার ড্রেস পরিবর্তন কক্ষে প্রবেশ করে এবং দ্রুতহস্তে জমকালো দস্যুড্রেসে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে সে।

নূরী গম্ভীর মুখে বসে ছিলো সোফায়, বনহুর এসে দাঁড়ায় তার পাশে, ওর মুখটা তুলে ধরে বলে— দস্যুকন্যা তুমি। তোমাকে এমন গম্ভীর মুখে বসে থাকা সাজে না নূরী। হাসো, হাসো নূরী। তোমার হাসিমুখ আমাকে সব সময় আনন্দ-উচ্ছল রাখবে।

নূরী পারে না হাসতে, বনহুর চলেছে এক দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর নরখাদক কাপালিকের সঙ্গে মোকাবেলা করতে। এই মুহূর্তে কি করে হাসবে নূরী! নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে— যাও হুর, আমি খুশিমনে তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, তোমার নূরী তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রইলো।

বনহুর নূরীর গন্ডে তার বলিষ্ঠ ওষ্ঠদ্বয়ের রক্তাভ ছাপ এঁকে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

❑

মরিলা দ্বীপে পৌঁছে বনহুর মুগ্ধ হলো। দ্বীপটা বড় সুন্দর আর মনোরম। কতকটা কাশ্মীরের মত মনে হয়। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে উঁচুনীচু জায়গা। কোথাও বা বেশ সমতল আবার কোথাও খুব উঁচু। মাঝে মাঝে টিলা আর ঝোপঝাড়। বড় বড় পাথরখন্ড ছড়িয়ে আছে গোটা দ্বীপময়।

দ্বীপের দক্ষিণে গাঢ় জঙ্গলে পূর্ণ।

এদিকে কোনো লোকালয় নেই, শুধু টিলা আর ঘন বন।

দ্বীপের উপর যেসব বাড়িঘর রয়েছে সেগুলো পাথর আর কাঠের তৈরি। সুন্দর করে এসব ঘরবাড়ি বানানো হয়েছে। কোথাও বা ঘন বসতি আবার কোথাও বেশ পাতলা। দ্বীপটা ছোট নয়—অনেক বড়, লোকসংখ্যাও অনেক বেশি।

মরিলা দ্বীপটা যেমন সুন্দর তেমনি দ্বীপের অধিবাসিগণ আরও সুন্দর। ধবধবে সাদা এদের গায়ের রং, মাথার রেশমের মত লালচে চুল। চোখগুলো ঘোলাটে ধরনের।

মেয়েগুলো আরও সুন্দর। লন্ডন বা আমেরিকার মেয়েদের মত নয়, চেহারার মধ্যে বেশ লাবণ্যতা আছে। চুলগুলো রেশমের মত কিন্তু ঘন আর কোঁকড়ানো। চোখগুলো ঘোলাটে হলেও চাহনি মায়াময়। রং ধবধবে হলেও গোলাপী আভা জড়ানো।

পুরুষরা কুঁচি দেওয়া ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে। মেয়েরা গারার, কেউ বা ঘাগ্‌ড়া আর ওড়না পরে। মাথায় এক ধরনের টুপি পরে পুরুষ এবং মেয়ে উভয়েই।

মেয়েদের চুল কালো লম্বা, কারো বা খাটো।

দ্বীপে পৌঁছেই বনহুর বুঝতে পেরেছে এখানের জনগণের মধ্যে ভীষণ একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে, সবাই যেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য উন্মুখ। কেউ কারো দিকে চাইতেও যেন শিউরে উঠে। জোরে কেউ কথা বলে না, কেমন যেন ফিসফিস করে কথা বলে সবাই।

বনহুর আর রহমান একটা হোটেলে উঠেছে। সমস্ত দিন ওরা দু'জন গোটা দ্বীপটা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। অবশ্য যতদূর পায়ে হেঁটে এগুতে পারলো ততদূরই যাওয়া সম্ভব হলো ওদের।

মরিলা দ্বীপের যেদিকটা ঘন বনে ঢাকা সেইদিকেই এগুচ্ছিলো ওরা।

পথচারিগণ তাদের বাধা দিয়ে বলেছিলো— তোমরা কি জানো না ঐ দিকে কাপালিক রাক্ষস আছে? হত্যা করে তোমাদের রক্ত শুষে খাবে সে।

বনহুর বলেছিলো— আমি কাপালিকের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি।

কথাটা শুনে হেসেছিলো পথচারিগণ, কিন্তু সে হাসি ছিলো ব্যথাকরুণ আর দুঃখময়।

রহমান আঁচ করে নিয়েছিলো, মনে মনে শিউরে উঠেছিলো সে। কিন্তু ফিরার যে আর কোনো উপায় নেই। যেমন করে হোক নরখাদক কাপালিককে হত্যা করতেই হবে।

বনহুর আর রহমান সন্ধ্যা অবধি এগুলো।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে মরিলা দ্বীপটা যেন কোনো যাদুকরের মায়াকাটির স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়লো।

আর এগুবে কি না ভাবছে বনহুর।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছে রহমান— এতোবড় একটা দ্বীপ মুহূর্তে কিভাবে নীরব হয়ে পড়লো! কোথাও জনপ্রাণী নেই, পথঘাট সম্পূর্ণ নিশ্চুপ, নিস্পন্দ।

প্রতিটা বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। দোকানপাট সব বন্ধ হলো। যানবাহন সব যেন হাওয়ায় উবে গেছে এক নিমিশে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব জেগে উঠলো।

বনহুর আর রহমান এবার হোটেলের দিকে পা চালালো। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে উঠছে। উভয়েরই দেহে জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, কোমরের বেল্টে গুলীভরা রিভলভার।

বনহুর আর রহমান এখন যে পথে এগুচ্ছিলো সে পথ ঘন জঙ্গলের পাশ দিয়েই এগিয়ে গিয়েছে লোকালয়ের দিকে।

পথ শুধু জনহীনই নয়, একেবারে ছমছমে অন্ধকারে ভরা। মাঝে মাঝে লাইটপোষ্ট আছে, কিন্তু সে সব লাইটপোষ্টে গ্যাসলাইট জ্বালানো হয়নি।

আর কারই বা এমন সাহস আছে যে লাইটপোষ্টে মই লাগিয়ে গ্যাসলাইটে গ্যাস ভরে আলো জ্বালাবে। সন্ধ্যার অনেক পূর্বে সবাই যার যার জীবন বাঁচিয়ে ঘরে লুকিয়ে পড়েছে।

বনহুর আর রহমান দ্রুত পা চালাচ্ছিলো।

আকাশে তারার প্রদীপ জ্বলে উঠলেও পৃথিবীর অন্ধকার কমেনি একটুও। চাঁদ উঠবে না কয়েক প্রহরের জন্য।

রহমান বললো—সর্দার, কেমন একটা শব্দ হচ্ছে।

হাঁ, শুনতে পাচ্ছি, পাশের জঙ্গলে ভারী কোনো জন্তুর পায়ের শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

রহমান বললো—সর্দার, পা চালিয়ে চলুন।

কেন, তোমার শরীর ছমছম করছে নাকি?

অহেতুক জীবননাশ হতে পারে... ...

অবশ্য সে কথা মিথ্যা নয়। না জানি আজ ভাগ্যে কি আছে। হোটেলে পৌঁছবো কিনা সন্দেহ।

বনহুরের কথা শেষ হয় না, একটা আর্তনাদ ভেসে আসে পাশের জঙ্গল থেকে। মানুষের গলার আওয়াজ।

বনহুর আর রহমান থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রহমান বললো— সর্দার, নিশ্চয়ই কাপালিকের কবলে কেউ প্রাণ হারালো।

বনহুর বললো— হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো রহমান।

ঐ শুনুন সর্দার, মানুষের মাথাটা কেটে নেবার পর যেমন রক্তের সোঁ সোঁ শব্দ হয় তেমনি শব্দ হচ্ছে।

বনহুর বললো— একেবারে কাছেই কোথাও শয়তান কাপালিক কাউকে হত্যা করলো বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর আর রহমানের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নস্বরে আলাপ হচ্ছিলো।

এবার বনহুর কোমরের বেল্ট হতে রিভলভারখানা দ্রুতহস্তে খুলে নিলো, জঙ্গলে প্রবেশ করবার জন্য অগ্রসর হতেই রহমান তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো—প্রাণ গেলেও আমি আপনাকে এই ঘন অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেবো না।

রহমান, বাধা দিও না, হয়তো সম্মুখেই কাপালিকটাকে পাবো।

সর্দার, দিনের আলোতে আপনি কাপালিকের সন্ধানে এই জঙ্গলে প্রবেশ করবেন কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। চলুন সর্দার এখান থেকে।

বনহুর রহমানের কথাটা ফেলতে পারলো না। সত্যিই পাশের জঙ্গলে তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। পথটা ঠিক জঙ্গলের পাশ কেটেই এগিয়ে গেছে সম্মুখের নগর বা লোকালয় অভিমুখে।

আজকের মত বনহুর নিজকে সংযত করে নিলো। রহমানসহ পা বাড়ালো আগের দিকে।

কিন্তু কয়েক পা এগুতেই সামনে পথে কোনো একটা বস্তুর সঙ্গে হোঁচট খেলো রহমান। চমকে ঝুঁকে পড়তেই শিউরে উঠলো সে ভীষণভাবে। পথের উপর পড়ে আছে একটা মস্তকহীন নরদেহ। যদিও অন্ধকার তবু বেশ বুঝা যাচ্ছে, মস্তকহীন গলা থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর বললো— কি হলো রহমান?

চাপা স্বরে বললো রহমান—সর্দার, মস্তকহীন দেহ!

বনহুর ঝুঁকে পড়লো— একটু পূর্বে এই হতভাগ্যই কাপালিক-হস্তে প্রাণ দিয়েছে... ...

বনহুরের কথা শেষ হয় না, একটা জমকালো মূর্তি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে, সে কি ভীষণ আকার এক মনুষ্যদেহ! অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা গেলো, ঐ জমকালো মনুষ্য-দেহটাই কাপালিক শয়তান।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুঁড়লো জমকালো মূর্তিটা লক্ষ্য করে। একটি নয়, পর পর দু'টি— কিন্তু আশ্চর্য! কাপালিকটা সঙ্গে সঙ্গে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্ধান হয়েছে।

রহমানের চোখে বিস্ময়, সে জানে— তার সর্দারের কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

বনহুর বললো— শয়তান পালিয়েছে।

চলুন সর্দার, ফিরে যাওয়া যাক্।

চলো।

❑

বনহুর আর রহমান হোটেলে ফিরে এলে হোটেলের মালিক তাদের জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করলো। মালিক তাদের ফিরতে বিলম্ব দেখে ভীষণভাবে ভয় পেয়েছিলো।

হোটেলের মালিকের কড়া হুকুম, সন্ধ্যার পর কেউ তার হোটেল থেকে বাইরে বের হতে পারবে না। প্রতিটি ক্যাবিনে মালিক নিজে গিয়ে সন্ধান করে দেখে, কোনো ক্যাবিনের লোক এখনও বাইরে আছে কিনা।

মালিক লোকটি অত্যন্ত ভালোমানুষ, তার হোটেলের প্রত্যেককে সে ভালোবাসে, সমাহ করে। তার হোটেলে থাকাকালীন কারো যেন কোনো কষ্ট বা অসুবিধা না হয় সেদিকে তার সূতীক্ষ্ণ নজর আছে।

মরিলা দ্বীপে এই হোটেলটার সুনাম আছে। বিশেষ করে মালিক ভালো, হোটেলের ব্যবস্থাও ভালো। দ্বীপে কাপালিক নরখাদকের আবির্ভাব ঘটবার পর থেকে বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে কিন্তু এ হোটেল থেকে আজও কেউ উধাও হয়নি। মালিকের সাবধানতার ফলেই কাপালিক এখনও এ হোটেলের কাউকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি।

আজ তার হোটেলে অবস্থানরত দু'জন যখন সন্ধ্যার পরও ফিরে এলো না তখন একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিলো মালিক হাউবার্ড। এমন তো আর তার হোটেলে হয়নি। সন্ধ্যার পূর্বেই হাউবার্ড। হোটেলের নেইম-লিষ্ট নিয়ে প্রত্যেকটা ক্যাবিনে গিয়ে সন্ধান করে দেখতো, সবাই ঠিক আছে কিনা। কেউ না থাকলে তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান চালিয়ে তাকে হোটেলে আনা হতো। তার হোটেলের যেন কোনো বদনাম না হয় সেদিকে ছিলো হাউবার্ডের সতর্ক দৃষ্টি।

রহমান আর বনহুর যতোক্ষণ বাইরে ছিলো ততোক্ষণ হাউবার্ডের উদ্বিগ্নতার সীমা ছিলো না। নিজে সে ব্যস্ত হয়ে হোটেলের ব্যালকুনিতে পায়চারী করছিলো। ওরা যখন সুস্থ দেহে ফিরে এলো তখন খুশির আবেগে জড়িয়ে ধরলো, কতবার যে বনহুর আর রহমানের কপালে চুম্বন করলো তা বলা যায় না।

বনহুর আর রহমান হাউবার্ডের আচরণে খুশি হলো অনেক। তাকে ধন্যবাদ জানালো ওরা।

রাতের মত খানাপিনা সেরে শুয়ে পড়লো বনহুর আর রহমান।

পাশাপাশি দুটি বিছানায় শুয়ে উভয়ে।

বনহুর চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট পান করছিলো আর গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো।

রহমান হঠাৎ কোনো প্রশ্ন করার সাহসী হচ্ছিলো না। সেও শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো কত কথা। বিশেষ করে রহমানের মনে তখন সন্ধ্যার সেই মস্তকহীন লাশটা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কি ভয়ঙ্কর নৃশংস হত্যাকান্ড!

বনহুর একসময় বলে উঠলো— রহমান, এই হোটেলে অবস্থান করে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। কারণ হোটেলের মালিক হাউবার্ডের দৃষ্টি এগিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে।

সর্দার, আমিও সেইরকম ভাবছি। আজই আমাদের সামান্য বিলম্বে হাউবার্ড যেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলো!

হাঁ, তুমি অন্য কোনো হোটেলে আমাদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করো। আমাদের কাজ শুধু দিনে নয়, রাতের অন্ধকারেও চলবে। কাপালিকটাকে যতক্ষণ শায়েস্তা না করেছি ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

❑

ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর ও রহমান। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যায় উভয়ের। বনহুর শয্যায় উঠে বসতেই রহমান অকস্মাৎ ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো— সর্দার, ঐ জানালার দিকে তাকান... আংগুল দিয়ে দেখানো সে সম্মুখস্থ একা জানালার দিকে।

বনহুর ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠলো, জানালার পাশ থেকে সা করে সরে গেলো একটা ভয়ঙ্কর মুখ। ক্ষণিকের জন্য হলেও বনহুর দেখলো, জমকালো একখানা মুখ, মুখে বিরাট লম্বা লম্বা দাড়ি আর গোঁফ। ভ্রুগুলো ঘন আর মোটা, ঝুলে নেমেছে চোখের উপর। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মাথায় রাশিকৃত ঝাকড়া চুল, মাঝে মাঝে

জট ধরে গেছে বলে মনে হলো। দাড়ি-গোঁফগুলোর ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলো বড় বড় সাদা ধবধবে দাঁত। কিন্তু বনহুর এক দণ্ডেই আরও লক্ষ্য করেছিলো, দাড়ি-গোঁফ আর সাদা দাঁতগুলো তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। কি ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য!

বনহুর বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। কিন্তু কোথাও আর কিছু নজরে পড়লো না।

বনহুর জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো, ততক্ষণে রহমান ও আরও অন্যান্য লোক এসে পড়েছে সেখানে, তাদের মধ্যে হোটেলের মালিক হাউবার্ডও আছেন। তিনি তো ভয়ে হাউমাউ করে কাঁদছেন।

বনহুর হোটেলের একজন কর্মচারীকে একটা লণ্ঠন আনতে বললো।

লণ্ঠন এলে সবাই লণ্ঠনের আলোতে দেখলো, জানালাটার পাশে খোলা বারান্দায় ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত পড়ে আছে।

রক্তের চিহ্ন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে গেছে পিছনের ব্যালকুনির দিকে।

বনহুর বিলম্ব না করে দক্ষিণ হস্তে গুলীভরা রিভলভার আর বাম হস্তে লণ্ঠন নিয়ে রক্তের ফোঁটাগুলো লক্ষ্য করতে করতে পিছন ব্যালকুনির দিকে এগুলো।

বনহুর পা বাড়াতেই হাউবার্ড জড়িয়ে ধরলো তাকে— তুমি ওদিকে যেও না যেও না বলছি...

বনহুর গম্ভীর গলায় বললো— বাধা দিবেন না, আমি দেখছি কোন্ দিকে গিয়েছে সেই নরখাদক।

হাউবার্ড তো নাছোড়বান্দা, সে আরও সবলে জড়িয়ে ধরলো যেও না, তোমাকেও মেরে ফেলবে।

বনহুর কোনোরকমে হাউবার্ডের হাত থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে রক্তের ছাপ লক্ষ্য করে দ্রুত এগুলো। রক্তের চিহ্ন ব্যালকুনি অবধি গিয়ে নিচে নেমে গেছে। অবাক হলো বনহুর, সিঁড়ি নেই অথচ কাপালিক কোন্ পথে উধাও হলো? হাওয়ায় উড়ে গেলো নাকি?

এতোক্ষণ যে রক্তের ফোঁটা লক্ষ্য করে বনহুর দ্রুত এগিয়ে এসেছিলো সে রক্ত যে কোনো নরমুণ্ডের তাতে কোনো ভুল নেই। কাপালিক নিশ্চয়ই

কাউকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তকটা এই পথে নিয়ে পালিয়ে গেছে, যাবার সময় উঁকি দিয়েছিলো তাদের কামরার জানালার পথে।

হতাশ হয়ে ফিরে এলো বনহুর রিভলভার আর লণ্ঠন হাতে।

হাউবার্ড বনহুরকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগলো, ভাগ্যিস, তাকে কাপালিক হত্যা করে ফেলেনি তাই রক্ষা।

বনহুর হাউবার্ডের হাত থেকে নিজকে উদ্ধার করে নিয়ে বললো— চলুন দেখি, কার মস্তকহীন দেহ আপনার হোটেলে পাওয়া যায়!

ভয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো হাউবার্ড— বলো কি, আমার হোটেলে মস্তকহীন দেহ...সর্বনাশ, এ কখনো হতে পারে না।

আমার হোটেলে মস্তকহীন দেহ থাকতে পারে না কিছুতেই...

বনহুর বললো— আপনার হোটেলেই কেউ খুন হয়েছে।

খুন! ...দু'চোখ কপালে তুলে বললো হাউবার্ড।

বনহুর বললো— দেখছেন না তাজা রক্তের ছড়াছড়ি।

মিথ্যা কথা। আমার হোটেলে খুন হতে পারে না কিছুতেই।

চলুন দেখছি... ... বনহুর লণ্ঠন হাতে রক্তের চিহ্ন লক্ষ্য করে হোটেলের বারান্দা ধরে অগ্রসর হলো।

বনহুরের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললো হোটেলের মালিক হাউবার্ড এবং অন্যান্য সবাই।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে সবার মুখ।

এমন কি রহমানের মুখমণ্ডলেও ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেও সকলের সঙ্গে বনহুরের পিছনে পিছনে অগ্রসর হচ্ছিলো।

কয়েকখানা ক্যাবিন পেরিয়ে রক্তবিন্দুগুলো একটা ক্যাবিনে প্রবেশ করেছে। আশ্চর্য, রক্তের ফোঁটা দরজা দিয়ে ভিতরে না গিয়ে পাশের জানালা দিয়ে ভিতরে চলে গেছে।

বনহুর এবং অন্যান্য সবাই এসে জানালাটার পাশে দাঁড়ালো। সকলের মুখই রক্তশূন্য ফ্যাকাশে। জানালার দিকে হতভম্বভাবে তাকিয়ে আছে সবাই।

বনহুর বললো— দরজা বন্ধ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। এই জানালা পথেই কাপালিক প্রবেশ করেছিলো ভিতরে।

হাউবার্ড জোরে রোদন করতে শুরু করলো, সে ভয়ে কাঁপছে, না জানি ভিতরে কাকে হত্যা করা হয়েছে।

বনহুরের আদেশে রহমান জানালাপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ক্যাবিনের দরজা খুলে দিলো।

দরজা মুক্ত হতেই বনহুর সর্বাগ্রে ভিতরে প্রবেশ করলো, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলে ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই ভয়ে শিউরে উঠলো। বনহুরের হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোতে দেখতে পেলো ওরা—বিছানায় শায়িত একটি মস্তকহীন দেহ পড়ে আছে। রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে বিছানাটা।

হাউবার্ড তো চিৎকার করে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে।

বনহুর হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীকে বললো— এই, তোমরা একে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও। তারপর চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করোগে।

বনহুরের আদেশে কয়েকজন লোক হাউবার্ডের সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

এবার বনহুর মস্তকহীন মৃতদেহটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। লোকটা বেশ মোটাসোটা, বয়স ঠিক আন্দাজ করা কঠিন তবে মধ্যবয়সীই বলে মনে হলো। দেহে মরিলা দ্বীপবাসীদের নাইট ড্রেস পরা রয়েছে। বনহুর ভালোভাবে লক্ষ্য করলো, কোনো সূতীক্ষ্ণ খর্গ দ্বারা লোকটার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে। গলার কাছে খানিকটা মাংস তখনও কেঁপে কেঁপে নড়ছে। দেহটা যদিও সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছে।

বনহুর ঝুকে পড়ে লণ্ঠনের আলোতে মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখে এবার তাকালো মেঝের দিকে। তাকিয়েই বনহুর বিস্ময়ে অস্ফুট আওয়াজ করে উঠলো— সর্বনাশ... ...একি, মানুষের পায়ের ছাপ না অন্য কিছু!

রহমানও অবাক কণ্ঠে বলে উঠলো— সর্দার, এ কি!

এটা কি মানুষের পা না অন্য কিছুর পায়ের ছাপ?

সবাই তখন পায়ের ছাপ লক্ষ্য করছে। রক্তের মধ্যে এলোমেলো বিরাট চওড়া কয়েকটা পদচিহ্ন ফুটে আছে। কমপক্ষে দেড় ফুট লম্বা এবং চওড়া

এক ফুটোর অনেক বেশি হবে। কোনো মানুষের পায়ের ছাপ কখনও এতো বড় হতে পারে না।

প্রথমেই বনহুর আর রহমান হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো, কারণ জানালার শিকগুলো এমনভাবে বাঁকিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো যা কোনো মানুষের দেহের শক্তির কাজ নয়। জানালাটার শিক বাঁকিয়ে সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিলো কাপালিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর বুঝতে পারলো, কাপালিকটা শুধু দেখতেই অসুরের মত নয়, শক্তিও অসুরের মত আছে তার দেহে। অল্পক্ষণের মধ্যে মরিলা দ্বীপের পুলিশ অফিসে সংবাদ পৌঁছানো হলো। পুলিশ ইন্সপেক্টর কয়েকজন পুলিশসহ এসে হাজির হলো হোটেলে। অনেক পরীক্ষা করেও এই হত্যারহস্যের সমাধান খুঁজে পেলো না, তারা লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে চলে গেলো।

এই ঘটনার পর হোটেলে একটা ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। হোটেলের প্রাচীন ডিংগে কাপালিকের প্রবেশ কম কথা নয়!

মরিলা দ্বীপের পথে-ঘাটে-মাঠে এখানে-সেখানে প্রতিদিন এমনি হত্যারহস্য সদা লেগেই রয়েছে। তবে এতোদিন কোনো বাড়ি বা হোটেলে প্রবেশ করে কাপালিক কোনো লোককে হত্যা করেনি। এই হত্যাটা তাই ভীষণভাবে মরিলাবাসিগণকে চিন্তিত করে তুললো।

হাউবার্ড তো সেই যে জ্ঞান হারিয়েছে দু'দিন তার জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণ নেই।

সেদিন বনহুর নিজের ক্যাবিনে বসে কাপালিক এবং তার হত্যারহস্য নিয়েই ভাবছিলো, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। কেউ কক্ষমধ্যে প্রবেশের পূর্বে এমনি বেল বাজানো এ হোটেলের নীতি।

বেলটা বেজে উঠতেই বনহুর সজাগ হয়ে বসলো— রহমান তো বাইরে গেছে, ফিরতে তার বিলম্ব আছে, তবে অসময়ে কে এলো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে!

বনহুর সোজা হয়ে বসতেই কক্ষে প্রবেশ করলো, এক মরিলা তরুণী। দেহে মহিলা দ্বীপবাসীর ড্রেস, দেহের বর্ণ খাঁটি গোলাপী। মাথায় ঝাঁকড়া রেশমী চুল। চোখ দুটিতে মায়াময় চাহনি। হাতে একটা ছোট ব্যাগ।

বনহুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো— আপনি এক্ষুণি চলুন, আমার বাবা আপনাকে ডাকছেন।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তরুণীর মুখে নিক্ষেপ করে অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর— কে আপনি? আর আপনার বাবাই বা কে? আমি তো আপনাকে চিনি না?

তরুণী অসহায় চোখে তাকিয়ে বললো— এই হোটেলের মালিক আমার বাবা...

বনহুর বলে উঠলো— হাউবার্ডের কন্যা তুমি?

হাঁ। এইমাত্র আমার বাবার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। তিনি বললেন, ৩নং ক্যাবিনের ভদ্রলোককে ডেকে আনো, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবো।

বনহুর আর বিলম্ব না করে তরুণীটিকে অনুসরণ করলো।

তরুণী বনহুরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

হোটেলের ভিতর দিয়ে এ পথ-সেপথ করে পিছনে এসে দাঁড়ালো তরুণী। একটা সরু সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

তরুণী বললো— এই সিঁড়ি দিয়ে আপনাকে নিচে নামতে হবে।

বনহুর বললো— আমি রাজি আছি।

তরুণী এবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললো।

বনহুর আর তরুণী একসময় নিচে অন্ধকারময় একটা ক্যাবিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

আঁতকে উঠলো যেন বনহুর, বললো— এই ঘরে তোমার বাবা থাকেন বুঝি?

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে বললো— হাঁ। আসুন আমার সঙ্গে।

তরুণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো।

বনহুরও ভিতরে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কক্ষটা হোটেলের নিচের তলায় এক কোণে। জায়গাটা খুব অন্ধকার। সূর্যের আলো কোনোদিন বোধ হয় এখানে পৌঁছতে পারেনি। কক্ষমধ্যে পাশাপাশি দু'টো ছোট ছোট খাট। একটি খাটের উপর শুয়ে আছে হোটেলের মালিক হাউবার্ড।

তরুণী চিকন মিষ্টি স্বরে বললো— বাবা, ৩নং ক্যাবিনের ভদ্রলোক এসেছেন।

কন্যার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চোখ মেলে তাকালো হাউবার্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে শয্যায় উঠে বসতে গেলো।

বনহুর হাউবার্ডের শয়নকক্ষ লক্ষ্য করে অত্যন্ত অবাক হয়ে পড়েছিলো, তবু সে তাড়াতাড়ি হাউবার্ডের শয্যায় বসে পড়ে তাকে পুনরায় শুইয়ে দিয়ে বললো— আমি আপনার পাশে বসছি, আপনি যা বলতে চান বলতে পারেন।

চারিদিকে ভীত নজরে তাকিয়ে বললো হাউবার্ড— আমার হোটেল থেকে সেই মস্তকহীন দেহটা... ...

হাঁ হাঁ, সেটা রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে মিঃ হাউবার্ড।

আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো.... ...

বনহুর বললো— আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না। মৃতদেহ পুলিশ সরিয়ে নিয়েছিলো।

ভয়কম্পিত কণ্ঠে বললো হাউবার্ড— পুলিশ! আমার হোটেলে পুলিশ কেন? খুন হয়েছে আমার হোটেলে হয়েছে, এতে পুলিশের মাথাব্যথা কেন বলুন তো?

বনহুরের হাসি পাচ্ছিলো, লোকটা পাগল না ভালো মানুষ? বললো বনহুর— কোনো হত্যাকান্ড ঘটলে সেখানে পুলিশ আসবেই এবং তদন্ত করবেই।

কেন, এ হত্যা কি আমাদের ইচ্ছাকৃত হত্যা? পুলিশ বেটার কেমন ক্ষমতা গ্রেফতার করুক দেখি কাপালিক বেটাকে! যতসব নেংটি ইঁদুর এগুলো। ওদের মাথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকতো তাহলে এতোদিন কাপালিক বেটা মরিলা দ্বীপ ছেড়ে কোথায় যে অন্তর্ধান হতো কে জানে!

বনহুর বললো— আপনি অসুস্থ, কাজেই বেশি কথা বলা আপনার পক্ষে উচিত নয়। আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করুন।

হাউবার্ড চোখ বন্ধ করে ফেললো কিন্তু মুখে সে কথা বলতে লাগলো, বললো— আপনি না হলে আজ আমি বাঁচতাম না। আমি শুনেছি, আপনিই আমাকে আমার ক্যাবিনে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এতোক্ষণে তরুণী কথা বলে আবার— হাঁ, আপনি যে উপকার করেছেন সেজন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

হাউবার্ড লাফিয়ে উঠে বললো এবার— কি ভুলটাই না করেছি, এতোক্ষণ আমার মেয়ে এলিন-এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেইনি! এসো মা এলিন, এঁর সঙ্গে হাত মিলাও।

এলিন এগিয়ে এলো, তারপর হাত বাড়িয়ে বনহুরের হাতে হাত মিলালো।

হাউবার্ড বললো— আপনার নামটা আমার হোটেলের খাতায় লেখা আছে কিন্তু মনে নেই—কি নাম যেন আপনার?

বনহুর বললো— মিঃ সোহেল।

হাঁ, ঠিক এবার আমার মনে পড়েছে। বড্ড ভুলে যাই আমি, মিঃ সোহেল। আর আপনার বন্ধুর নামটা কি যেন?

মিঃ রুহেল...

হাঁ হাঁ, এবার আর ভুলবো না— মিঃ সোহেল ও মিঃ রুহেল— ঠিক মনে থাকবে এখন। খুশিতে হাসে হাউবার্ড।

তরুণী গম্ভীর হয়ে বলে— বাবার কথায় আপনি মনে কিছু করবেন না, আমার বাবা বড্ড ছেলেমানুষের মত।

বনহুর বললো— আমি তো পূর্বেই বুঝতে পেরেছি।

বনহুর আর রহমান এখানে নিজেদের কান্দাইবাসী বলে পরিচয় দিয়েছে এবং নিজেদের নাম মিঃ সোহেল আর মিঃ রুহেল বলেছে।

❑

এরপর কয়েকদিন বেশ কেটে যায়। হোটেলে কোনো বিভ্রাট না ঘটলেও মরিলার পথে কয়েক দিনে প্রায় বিশটা মস্তকহীন মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে।

বনহুর আর রহমান এই কয়েকদিনে কিছুই করে উঠতে পারেনি। অনেক চেষ্টাতেও নরখাদক কাপালিকের সন্ধান পায়নি তারা।

কাপালিকের খবর পেয়ে ছুটে গেছে সেখানে বনহুর আর রহমান কিন্তু তারা পৌঁছবার পরেই কাপালিক উধাও হয়েছে। শুধু তার শিকার মস্তকহীন দেহটা পড়ে থাকতে দেখা গেছে পথের ধূলায়।

হোটেলের মালিক হাউবার্ড তার হোটেলে ভয়ানকভাবে সাবধানতা অবলম্বন করেছে। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে, একটা বিড়াল পর্যন্ত যেন তার হোটেলে প্রবেশ করতে না পারে।

সেদিন বনহুর অবাক না হয়ে পারেনি—এতো বড় একটা হোটেলের মালিক অথচ সে কিনা থাকে কেমন একটা অন্ধকারময় ছোট ক্যাবিনে। ভেবে পায়নি বনহুর এমন নিভৃতে থাকার কারণ কি!

পরে বনহুর আরও জানতে পারলো, হাউবার্ড তার কন্যাকেও নিজের ঘরে রাখে না, তার শোবার কামরা ছেড়ে বেশ দূরে রয়েছে কন্যা এলিনের কামরা।

প্রায়ই এলিন মিঃ সোহেলবেশী বনহুরকে ধরে আনতো নিজের ক্যাবিনে, বলতো— আপনাকে বিরক্ত করবো, তাতে আপনি মনে কিছু নেবেন না তো?

বনহুর তার চালচলন এবং চাহনিতে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। অদ্ভুত মেয়ে এলিন— শুধু সুন্দরীই নয় সে, তার কথাবার্তা বড় সুন্দর আর সচ্ছ।

বনহুর এলিনকে দেখলেই ভাবতো, হাউবার্ডের মত লোকের এমন কন্যা হলো কি করে! হাউবার্ড শুধু কালোই নয়, আর চেহারাটাও কেমন যেন বে-খাপ্পা!

একদিন বনহুর এলিনকে জিজ্ঞাসা করে বললো— এলিন, তোমার বাবার কি তুমি আপন কন্যা?

খিলখিল করে হেসে বলেছিলো এলিন— হাঁ, একেবারে আপন। কেন, আপনার বুঝি সন্দেহ হয়?

বনহুর বলেছিলো— হয় বৈকি, কারণ হাউবার্ড আর তোমার চেহারার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

হাঁ, অনেকেই আপনার মত অবাক হয়। হাউবার্ড আমার বাবা নয়, এমনও বলেছে অনেকে।

বনহুর আর এলিনের মধ্যে দিন দিন কেমন যেন একটা ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠে। প্রায় সময়ই আজকাল এলিনের পাশে দেখা যায় বনহুরকে।

রহমান ভিতরে ভিতরে একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়।

কই, তার সর্দারকে ইতিপূর্বে কোনো মেয়ের সঙ্গে এমনভাবে গায়ে পড়ে মিশতে দেখেছে বলে মনে হয় না। এলিনের চেয়ে আরও অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার সর্দারের পরিচয় ঘটেছে। রহমান লক্ষ্য করেছে, এলিনের সঙ্গে মিশবার জন্য বনহুর যেন সদা উদগ্রীব।

এই অল্প কয়েক দিনেই উভয়ে যেন অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে।

রহমান সর্দারকে কিছুই বলতে পারে না, ভিতরে ভিতরে গুমরে মরে সে। রহমান চায় না তার সর্দার কোনো মেয়ের প্রেমে আকৃষ্ট হয়।

সেদিন হোটেলের ছাদে রহমান হঠাৎ এসে পড়ে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়, দেখতে পায় এলিন আর বনহুর বসে আছে পাশাপাশি। এলিনের হাতখানা সর্দারের হাতের মুঠায়।

রহমান আর দাঁড়াতে পারলো না, ক্ষুব্ধভাবে চলে গেলো সেখান থেকে। নিজের কামরায় গিয়ে রহমান পায়চারী শুরু করলো, মনের মধ্যে তার ভয়ানক একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। সর্দার সামান্য একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলো? কোথায় কাপালিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে, না... ...

হঠাৎ বনহুরের কণ্ঠস্বর— রহমান... ...

রহমানের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, চমকে ফিরে তাকায়, কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—সর্দার।

রহমান, এলিন আমাকে আর তোমাকে তার ক্যাবিনে রাতে খেতে বলেছে। এলিন নিজের হাতে রান্না করে আমাদের খাওয়াবে।

রহমান গম্ভীরকণ্ঠে বলে— সর্দার, মাফ করবেন, আমার পেটটা আজ মোটেই ভাল নেই।

রহমানের গলার স্বরে বনহুর বুঝতে পারে, সে অভিমান করেছে। আসলে তার পেটে কোনো অসুখ হয়নি। মনে মনে হাসে বনহুর, বলে— তোমার জন্য নিরামিশ রান্না করতে বলবো।

সর্দার, আমাকে মাফ করবেন, আমি হোটেল ছাড়া কোথাও খাবো না।

বনহুর হেসে বললো— বেশ, তাহলে আমি একাই এলিনের আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

রহমান কোনো কথা বললো না।

বনহুর বেরিয়ে যাচ্ছিলো, রহমান পিছু ডেকে বললো— সর্দার!

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো— বলো?

আমি ভাবছি এবার ফিরে গেলে হয় না?

গম্ভীর শান্তকণ্ঠে বললো বনহুর— আমাদের কাজ শেষ হয়েছে রহমান?

রহমান অবাক দৃষ্টি তুলে তাকালো, তারপর দৃষ্টি নত করে নিলো, কোনো জবাব সে দিলো না বা দিতে পারলো না।

বনহুর বললো— কাজ শেষ হলে আমরা মরিলা দ্বীপ ত্যাগ করবো। কথাটা বলে বেরিয়ে যায় বনহুর।

রহমান মনের ক্রুদ্ধভাব মনে চেপে চুপ করে থাকে।

❑

পাশাপাশি দুটো বিছানায় শুয়ে আছে বনহুর আর রহমান। সমস্ত হোটেল বাড়ি নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে হোটেলের ঘড়িটা প্রহর ঘোষণা করে চলেছে।

হোটেলের ভিতরে রন্ধনশালা থেকে চিমনির ধূঁয়োর ক্ষীণ রেখা আকাশে ভেসে যাচ্ছিলো। কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে হোটেলের বারান্দায়। হঠাৎ কেউ যেন আচমকা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যই এই লণ্ঠনগুলো এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো।

হোটেলের গেটে একটা মরিলা দ্বীপবাসী পাহারাদার। সে রীতিমত বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে। তবে মাঝে কখনও কখনও ঘুমে জড়িয়ে আসছে তার চোখের পাতাগুলো।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

রহমান কিন্তু ঘুমায়নি, সে ঘুমের ভান করে সর্দারের কাজ লক্ষ্য করছিলো। বনহুর যখন শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো তখন রহমান সজাগ হয়ে চোখ মেললো।

বনহুর পরে নিলো তার ড্রেস। জমকালো দস্যু পোশাক। রিভলভারটা হাতের মুঠায় চেপে ধরে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

রহমান তাকে অনুসরণ করলো, সর্দার ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই সেও বেরিয়ে এলো আলগোছে।

বনহুর হোটেলের পিছন দিকে অগ্রসর হলো।

রহমান থামের আড়ালে আত্মগোপন করে তাকে লক্ষ্য রাখলো।

বনহুর সোজা পিছনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো।

রহমান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে ভীষণভাবে। বনহুর যে মিস এলিনের ক্যাবিনের দিকে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রহমান রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

বনহুর যখন নিচে নেমে গেলো তখন রহমান উপর থেকে দেখতে লাগলো কোন্ দিকে যায় তার সর্দার। এলিনের ক্যাবিনে, না অন্য কোথাও।

যেখান হতে এলিনের দরজা স্পষ্ট দেখা যায় ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়ালো রহমান। নীচ থেকে রহমানকে ঠিক দেখা যাবে না। রহমান স্তব্ধ নিঃশ্বাসে দেখছে তার সর্দার এসে দাঁড়ালো এলিনের দরজায়।

রহমানের বুকটা ধক্‌ধক্ করছে, কেন যেন সে সহ্য করতে পারছিলো না এই ব্যাপারটাকে। তবু সে নিশ্চুপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর এলিনের দরজায় মৃদু টোকা দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো, বেরিয়ে এলো এলিন।

রহমান স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছে, এলিনের দেহে নাইট ড্রেস। বনহুরকে দেখেই এলিন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

বনহুর এলিনের হাতখানা বাম হস্তে তুলে নিয়ে কিঞ্চিৎ উবু হয়ে হাতের পিঠে চুম্বন করলো। বনহুরের দক্ষিণ হস্তের রিভলভারখানা মুহূর্তের জন্য চক্ চক্ করে উঠলো।

রহমান আর দাঁড়াতে পারলো না, সে দ্রুত ফিরে গেলো নিজের ক্যাবিনে। অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করতে লাগলো, সে নিজের চোখকে কি করে অবিশ্বাস করবে। সর্দার তো পূর্বে এমন ছিলো না।

রহমান শয্যা গ্রহণ করে কিন্তু ঘুমাতে পারে না। সব সময় দৃষ্টি তার ঘড়ির কাঁটার দিকে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চলে এখনও ফিরে এলো না বনহুর। রহমানের মুখ রাঙা হয়ে উঠে, তবে কি সর্দার এতোক্ষণ এলিনের ক্যাবিনে রয়েছে? না না, এতো জঘন্য হতে পারে না তার সর্দার...

রহমানের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, বনহুর প্রবেশ করে ক্যাবিনে।

রহমান ঘুমের ভান করে চুপচাপ পড়ে থাকে।

বনহুর ড্রেস পরিবর্তন করে শয্যা গ্রহণ করে। রিভলভারখানা শোবার পূর্বে বালিশের নিচে রেখে চোখ বন্ধ করলো।

বনহুর অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়লো।

রহমানের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। সে ভেবে চলেছে হঠাৎ সর্দারের মধ্যে এমন পরিবর্তন এলো কি করে। দেবচরিত্র তার সর্দার এমনভাবে একটা

মেয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়বে, এটা যেন তার কল্পনার বাইরে। মরিলা দ্বীপে এসেছে তারা শয়তান নরখাদক কাপালিককে শায়েস্তা করতে কিন্তু একি ঘটে চলেছে...নানারকম চিন্তা করতে করতে একসময় রাত ভোর হয়ে আসে।

ভোরেই শোনা যায়, আজ মরিলা দ্বীপে একসঙ্গে পাঁচটি মস্তকহীন মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। কয়েকটা মৃতদেহের মধ্যে দুটো মরিলা দ্বীপের অধিবাসী আর তিনটা মরিলা দ্বীপের বাইরের লোক, তাদের দেহের পোশাক দেখে অনুমান করা হয়েছে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে রহমান গম্ভীর মুখে ক্যাবিনে প্রবেশ করলো, হাতে একখানা কাগজ।

বনহুর বললো— ওটা কি রহমান?

রহমান কাগজখানা এগিয়ে দিলো— দেখুন সর্দার।

কাগজখানা কোনো পত্রিকা নয়— একটা রিপোর্ট। বনহুর রিপোর্টখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো— আজ রাতে পাঁচটা মস্তকহীন মৃতদেহ পাওয়া গেছে—সর্বনাশ!

শুধু সর্বনাশই নয় সর্দার, আর কয়েক দিনে মরিলা দ্বীপ মানবশূন্য হয়ে পড়বে।

হুঁ, তাই মনে হচ্ছে। নরখাদক কাপালিক দেখছি পাল্লা দিয়ে নরহত্যা শুরু করেছে।

সর্দার, আমরা আজও কাপালিকটার কোনো কিছুই করতে পারলাম না। কথা কয়টা বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললো রহমান।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো— রহমান, প্রস্তুত হয়ে নাও, নাস্তা সেরে নিয়ে আমরা বের হবো। কোথায় এসব লাশগুলো পাওয়া গেছে জানতে চাই।

সর্দার, একটা কথা বলতে চাই আমি?

থাক্, আজ নয়, আরও পরে বলো। যাও, তুমি তৈরি হয়ে নাও।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করলো।

রহমান বেরিয়ে গেলো তৈরি হবার জন্য।

মরিলা পুলিশ অফিসে পৌঁছে অবাক না হয়ে পারলো না বনহুর। একসঙ্গে এতোগুলো বীভৎস লাশ দেখে পুলিশমহল ভয়ে-ত্রাসে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সবাই।

বনহুর আর রহমান মরিলা পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ লোরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলাপ করে নিলো। প্রথমে ওরা বনহুর আর রহমানকে দেখে আশ্চর্য এবং সন্দিহান হয়ে পড়েছিলো, কারণ বনহুর আর রহমানকে মরিলা দ্বীপবাসী বলে মনে হয় না। তাছাড়াও এদের ড্রেস ভিন্ন ধরনের ছিলো। কাজেই সন্দেহ হবার কথাই বটে।

বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হবার পর মরিলা পুলিশ ইন্সেপেক্টর মিঃ লোরী বনহুরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানালেন। খুব খুশি হলেন তারা বনহুর আর রহমানের মনোভাব জানতে পেরে।

বনহুর আর রহমানকে আশ্বাস দিলেন মিঃ লোরী—কাপালিক হত্যা ব্যাপারে তাঁরা পুলিশমহল তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

বনহুর পুলিশমহলে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারলো তারা কাপালিক ব্যাপারে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছেন। বিশেষ করে এই রহস্যময় হত্যাকান্ডের জন্য তাঁরা কি করবেন, কিভাবে কাপালিকের পিছু ধরবেন, কোনোই সমাধান খুঁজে পাননি। তবে দেশবাসিগণকে রক্ষার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি তাঁরা।

সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যার পর কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায়। কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছিলো কিন্তু পাহারারত পুলিশগুলোও যখন নিহত হতে শুরু করলো, তখন পুলিশগণ ভয়ানকভাবে ভীত হয়ে পড়লো—চাকরি ত্যাগ করতে তারা রাজি আছে কিন্তু সন্ধ্যার পর বাইরে থাকতে কেউ রাজি নয়।

মরিলা দ্বীপে কয়েকজন পুলিশও কাপালিক হস্তে জীবন দিয়েছে।

রাতে তাদের পাহারায় নিযুক্ত রাখা হয়েছিলো। পরদিন দেখা গেছে, যে স্থানে তারা পাহারা ছিলো সেই স্থানে পড়ে আছে তাদের মস্তকহীন দেহ, রক্তে চুপথে আছে পথের বুক!

এরপর কোনো পুলিশ পাহারা দিতে রাজি হয়নি।

পুলিশ ভ্যান সন্ধ্যার পূর্বে রাজপথে বেরিয়ে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে আসতো। মাঝে মাঝে সংকেতধ্বনি করে দ্বীপবাসীগণকে সজাগ করে দেওয়া হতো।

বনহুর পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করার পর মস্তকহীন দেহগুলো স্বচক্ষে দেখলো। কি ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হত্যাকান্ড!

পুলিশ অফিস থেকে বেরিয়ে বনহুর আর রহমান লাশগুলো কোথায় পাওয়া গেছে সেই সব জায়গা দেখলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার তাঁর গাড়িতে করেই নিয়ে গিয়ে সেইসব জায়গা দেখালেন।

সমস্ত দিন ধরে এইসব তদন্ত করে সন্ধ্যার পূর্বে হোটেলে ফিরে এলো বনহুর আর রহমান। এসেই দেখলো তাদের আগমন প্রতীক্ষায় হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাউবার্ড সশরীরে।

বনহুর আর রহমানকে দেখে খুশি হয়ে বললো—যাক, সকাল সকাল ফিরে এসেছো তাহলে। এমনি না হলে হয়!

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই এলিন এসে হাজির হলো, হেসে বললো—সারাটা দিন কোথায় ছিলেন আপনি? হাত দু'খানা দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলো বনহুরের গলা।

বনহুর সরে দাঁড়ালো সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করার ভান করে।

রহমান এলিনের ভাবসাব লক্ষ্য করে মুখ গম্ভীর করে ফেললো, বেরিয়ে গেলো সে এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে।

বাইরে গিয়েও রহমানের মধ্যে স্বস্তি এলো না, রাগে গসগস করতে লাগলো সে। কক্ষমধ্য হতে শোনা যাচ্ছে এলিনের হাসির শব্দ।

রহমান কান পেতে রইলো সর্দারের কণ্ঠ শোনা যায় কিনা—হাঁ, সত্যি বনহুরও হাসছে এলিনের সঙ্গে।

রহমান সরে গেলো সেখান থেকে।

❑

ঐদিন রাতে আবার হোটেলে এক মর্মস্পর্শী আর্তনাদ জেগে উঠলো। ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের, সঙ্গে সঙ্গে রহমানেরও।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো ওরা। সেকি তীব্র আর তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার। বনহুর রিভলভার হাতে নিয়ে ছুটলো হোটেলের পিছন ক্যাবিনের দিকে।

রহমানও অনুসরণ করলো আর একটা রিভলভার নিয়ে সর্দারকে।

হোটেলটা সম্পূর্ণ অন্ধকার, বারান্দা ধরে দ্রুত ছুটছিলো ওরা। হঠাৎ বনহুরের দেহে ধাক্কা লাগলো কোনো একটা দেহের সঙ্গে।

বনহুর পড়ে যেতে যেতে টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, অন্ধকার হলেও বনহুর আর রহমান স্পষ্ট দেখলো, জমকালো একটা বিশালদেহী লোক তাদের পাশ কেটে সা করে চলে গেলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলভার উদ্যত করলো, নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে শব্দ হলো, গুড়ুম...

কিন্তু কোনো আর্তনাদই ভেসে এলো না বিপরীত দিক থেকে।

ততক্ষণে এদিক-ওদিক থেকে হোটেলের লোকজন ছুটে এসেছে,— কারো হাতে লণ্ঠন, কারো হাতে টর্চ লাইট।

বনহুর আর রহমান দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখোভাবে দারুণ উদ্বিগ্নতার ছাপ বিদ্যমান।

রহমান বললো লোকজনদের উদ্দেশ্য করে— এই দিকে পালিয়েছে...

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলো— কে পালিয়েছে?

রহমান বললো—জমকালো একটা লোক। নিশ্চয়ই শয়তান কাপালিক হবে।

যে পথে অন্ধকারে কালো লোকটা পালিয়েছিলো, বনহুর এবং অন্যান্য সকলে দেখলো— সেদিনের মত বেলকুনির উপর ছড়িয়ে আছে তাজা লাল টকটকে রক্ত।

ওদিকে হোটেলের এক ক্যাবিনে প্রবেশ করে একজন লোক, আর্তনাদ করে উঠলো— খুন, খুন, আজ আবার খুন হয়েছে!

ছুটলো সবাই সেই দিক লক্ষ্য করে।

একটা ক্যাবিনে প্রবেশ করে সকলের চক্ষু স্থির হলো— দেখলো একটা মস্তকহীন মৃতদেহ পড়ে আছে পাশের শয্যার উপর।

খবর পেয়ে হা হা করে ছুটে এলো হোটেলের মালিক হাউবার্ড ও তার কন্যা এলিন।

কিন্তু হাউবার্ডকে ক্যাবিনের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না। হঠাৎ আজ আবার তিনি যদি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন তখন বিভ্রাট ঘটতে পারে।

হাউবার্ডকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, তিনি খুনের কথা শুনেই একেবারে জ্ঞান হারাবার জোগাড় হয়েছেন। অনেকে নানাভাবে সান্ত্বনা জোগাতে লাগলো।

বনহুর হতাশ হয়ে ফিরে এলো নিজের ক্যাবিনে। তার সমস্ত মুখমন্ডলে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে— আশ্চর্য, এতো সতর্কতার মধ্যেও ঠিক নিয়মমত খুন করে চলেছে নরখাদক কাপালিক। কেউ তাকে শায়েস্তা করতে সক্ষম হচ্ছে না। বনহুর নিজেও হতাশ হয়ে পড়েছে।

রহমানও অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছে সর্দারকে এখানে নিয়ে আসার পিছনে রয়েছে সে। হঠাৎ যদি সর্দারের কিছু একটা হয়ে পড়ে তখন সম্পূর্ণ দোষী হবে সে।

❑

পরদিন আবার খুন হলো।

একটি নয়, দু'টি— তাও হোটেলের ক্যাবিনে।

বনহুর শুধু অবাকই হলো না, হতভম্ব হলো। কাপালিকের আক্রোশ এবার হোটেলে এসে সীমাবদ্ধ হলো। বাইরেও খুন, হোটেলেও খুন, দ্বীপের অন্যান্য স্থানেও খুন। একটা লোক এতো খুন করছে, অথচ তাকে কেউ আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে না বা তাকে হত্যা করতে পারছে না।

এই অদ্ভূত কাপালিকটা কোথা হতে আসে, আবার কোন্ পথে কোথায় চলে যায়, কে জানে! দিনের পর দিন শুধু হত্যাই করে চলেছে, যেন বিরাম নেই সে হত্যার।

বনহুর অনেক চিন্তা করেও এই কাপালিকটার কোনোই হদিস্ করতে পারলো না।

মরিলা দ্বীপে বনহুরের আগমনের পর প্রায় সপ্তাহ কয়েক কেটে গেলো। বনহুর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে, শুধু মরিলা দ্বীপেই নয়, আশেপাশে অনেক স্থানে এমনি মস্তকহীন নরদেহের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

আজকাল বনহুর প্রায়ই এলিনের কামরায় বেশি সময় কাটায়। হয়তো কাপালিকের হদিস না করতে না পেরে মনের অস্থিরতার জন্যই সে এলিনের সান্নিধ্য লাভে আনন্দ বোধ করে।

এলিন বনহুরকে পেলে সব ভুলে যায়, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে সে।

রহমানের মনটা আজকাল বড় ভাল যাচ্ছে না, সে বনহুর আর এলিনকে নিয়ে বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছে। সর্দারকে এ ব্যাপার নিয়ে কিছু বলাটাও সে সমীচীন মনে করে না।

হঠাৎ একদিন বনহুর রহমানকে বলে বসলো— রহমান, আজ রাতে হোটেলে খুন হবে.....

রহমান দু'চোখ কপালে তুলে বললো— একি বললেন, সর্দার?

হাঁ, সত্যি কথা বলছি। আজ রাতে কাপালিক হোটেলে হানা দেবে।

সর্দার!

রহমান, তুমি এ কথা কাউকে বলবে না।

ঢোক গিলে বললো রহমান— সর্দার, আপনি.....

আমি জানতে পেরেছি, কাপালিক আজ এই হোটেলে হানা দেবে। শোন রহমান, আজ তুমি ভিন্ন ক্যাবিনে শোবে। আমি একা থাকতে চাই আমাদের ক্যাবিনে। বিশেষ করে সে আমাদের ক্যাবিনেই আগমন করবে।

রহমানের মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ হলো না। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো সে সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো— রহমান, আজ তুমি ভিন্ন ক্যাবিনে শয়ন করবে, কথাটা যেন ভুলে যেও না।

সর্দার।

হাঁ, কারণ আমাদের ক্যাবিনে আমি একা থাকতে চাই।

তা হয় না সর্দার।

আমি যা বলছি সেইভাবে কাজ করবে। কারণ কাপালিক জানতে পেরেছে, আমরা তার পিছু লেগেছি। তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছি।

সর্দার, আমি আপনাকে একা এ ক্যাবিনে থাকতে দিতে পারি না সর্দার। মরতে হয় দু'জনই মরবো.....

হেসে উঠলো বনহুর— মরতে চাও? পাগল আর কি। মরা তোমার চলবে না, বুঝলে?

বাঁচতে আমি চাই না সর্দার। হঠাৎ আপনার যদি কিছু একটা হয়ে যায়।

হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো.....যাও রহমান, সন্ধ্যার পূর্বেই তুমি অন্য ক্যাবিনে তোমার শয়নের ব্যবস্থা করে নাও।

রহমান বাধ্য হয়ে ছাত্রের মত মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো।

❑

রাত বেড়ে আসছে।

রহমান তার ক্যাবিনে রিভলভার হস্তে পায়চারী করে চলেছে। সর্বদা কান দু'টোকে সজাগ রেখেছে সে, উৎকণ্ঠা আর উদ্বিগ্নতায় চঞ্চল তার মন। না জানি তার সর্দার আজ কাপালিক হস্ত হতে পরিত্রাণ পাবে কিনা, কে জানে।

বনহুর তখন বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে আপন মনে সিগারেট পান করে চলেছে। মাঝে মাঝে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো সে। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ তার মুখমন্ডল অনেকটা প্রসন্ন সচ্ছ মনে হচ্ছে।

হোটেলের ঘড়ি রাত দুটো ঘোষণা করলো।

বনহুর বিছানা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, পরে নিলো তার নিজস্ব দস্যু ড্রেস।

রহমান তার ক্যাবিনে থাকলেও জানালার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলো সে সর্দারের ক্যাবিনের দিকে। কাপালিক কখন কোন মুহূর্তে আগমন করে দেখবে এবং যদি দরকার হয় সর্দারের জীবন রক্ষার্থে কাপালিকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, প্রাণ দিতে হয় তাও দেবে রহমান।

হোটেলের বারান্দায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। রহমান জানালার ফাঁকে উঁকি দিয়ে বারবার দেখে নিচ্ছিলো সর্দারের ক্যাবিনের দরজাটা।

বারান্দায় লটকানো লণ্ঠনের আলোতে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো বনহুরের ক্যাবিনের দরজা এবং ওদিকের আরও খানিকটা অংশ।

রহমান হঠাৎ চমকে উঠলো, সে লক্ষ্য করলো—সর্দারের ক্যাবিনের দরজা খুলে গেলো। শিউরে উঠলো রহমান, মুহূর্তের জন্য মুখ তার কালো হয়ে উঠলো, তবে কি ভিতরে কাপালিক প্রবেশ করেছিলো? সর্দারকে হত্যা

করে বেরিয়ে আসছে! রহমান তার রিভলভার জানালার ফাঁক দিয়ে উঁচু করে ধরলো, কাপালিক বের হবার সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুঁড়বে সে। রুদ্ধ নিশ্বাসে লক্ষ্য করছে রহমান, বুক তার ঢিপ্ ঢিপ্ করছে ভীষণভাবে, না জানি কি সে লক্ষ্য করবে এই মুহূর্তে!

বনহুরের ক্যাবিনের দরজা খুলে গেলো, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বনহুর স্বয়ং।

রহমান বিস্ময়ে স্তব্ধ হলো, ধীরে ধীরে রিভলভারখানা সরিয়ে নিলো সে জানালার ফাঁক থেকে। কিন্তু দৃষ্টি সে সরিয়ে নিতে পারলো না, দেখতে লাগলো কি করে সর্দার।

বনহুর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে তাকালো চারিদিকে।

বনহুরের দেহে জমকালো ড্রেস, দক্ষিণ হস্তে চক্‌চক্ করে উঠলো তার জমকালো রিভলভারখানা। সোজা সে সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে।

রহমান স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে, সর্দার এভাবে কোথায় চলেছে? সে নিজকে ধরে রাখতে পারলো না, জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো দরজা খুলে অতি সন্তর্পণে।

বনহুরকে অনুসরণ করলো রহমান।

..একি! সর্দার পিছন সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তবে কি সর্দার এলিনের কক্ষে যাবে? না না, তা হয় না, এতো জঘন্য নীচ হতে পারে না তার সর্দার। রহমান একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে অধর দংশন করে।

তার চিন্তা মিথ্যা নয়, বনহুর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে। রহমান দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে আছে।

বনহুর সোজা এলিনের দরজায় এসে মৃদু টোকা দিলো।

দরজা খুলে গেলো, এলিন বেরিয়ে এলো একরকম প্রায় হাত ধরে টেনে নিলো ভিতরে।

বনহুর কোনো আপত্তি না করে এলিনের কামরায় প্রবেশ করলো।

রহমানের দেহের রক্ত মুহূর্তে গরম হয়ে উঠলো, ইচ্ছা হলো এই দন্ডে গিয়ে সর্দারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে, সর্দার, একি করছেন আপনি...পায়ের নিচে মাটি যেন দুলছে রহমানের, সে আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলো না, ফিরে গেলো নিজের ক্যাবিনে।

শয্যায় শয়ন করতে পারলো না রহমান, বসে দু'হাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলে। সে কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

তার সর্দারের মত ব্যক্তি সামান্য একটি মেয়ের প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তার সঙ্গে ছলনা করলো। রাতে এলিনের সঙ্গে কাটাবে বলে তাকে ভিন্ন ক্যাবিনে পাঠানো হলো। কিন্তু সর্দার তো কোনোদিন এমন ছিলো না।

এক সময় ভোর হয়ে আসে।

রহমান আজ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সে নিজে কিছুতেই সর্দারের ক্যাবিনে যাবে না। যে ক্যাবিনে রাতে ছিলো সেই ক্যাবিনেই বসে রইলো চুপচাপ।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চলেছে।

রহমান ক্ষুদ্ধ হলেও প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন আসবে সর্দার তার সন্ধানে।

এক সময় রহমান পদশব্দে চোখ তুলে তাকালো।

বনহুর তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

রহমান উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির আভাস লেগে রয়েছে।

রহমান বনহুরের মুখে নত দৃষ্টি তুলে ধরে, মনে মনে আরও ক্ষুদ্ধ হলো, কিন্তু মুখে কিছু না বলে চুপ রইলো।

বনহুর বললো— রহমান, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে রাতে তুমি মোটেই ঘুমাওনি?

রহমান কোনো জবাব না দিয়ে থাকতে পারলো না, সে বললো— সর্দার, কাপালিকের আগমন আশঙ্কায় আমার চোখে ঘুম আসেনি।

হাঁ, তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি।

সর্দার, কাপালিক কাল রাতে হোটেলে হানা দেবার কথা ছিলো, কিন্তু সে..

দেয়নি, এই তো?

হাঁ।

শুধু হোটেলেই নয় রহমান, কাল সে কোথাও হানা দেয়নি, সমস্ত দ্বীপে বা দ্বীপের বাইরে কোথাও হত্যাকান্ড হয়নি।

আশ্চর্য হয়ে তাকালো রহমান সর্দারের মুখের দিকে। কি করে সর্দার এই সকাল বেলাই জানতে পারলো আজ কোথাও হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি? এখনো তো বাইরের কোনো খবর এসে পৌঁছায়নি হোটেলে।

বনহুর রহমানের মনোভাব বুঝতে পেরে বললো— আমি কাপালিককে আজ আটকে রেখেছিলাম রহমান।

সম্মুখে ভূত দেখলে যেমন মানুষ চমকে উঠে তেমনি ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠলো রহমান। দু'চোখ ছানাবড়া করে তাকালো সে সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো— এসো আমার সঙ্গে।

কোথায় যাবেন সর্দার?

হাউবার্ডের ক্যাবিনে। বেচারী তো কাল কাপালিকের ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বড় ভীতু হাউবার্ড।

রহমান আর বনহুর এগুলো সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে। হোটেলের নিচে এক কোণে হাউবার্ডের শয়নকক্ষ। এতোবড় হোটেল অথচ মালিক একেবারে নিচে এবং নির্জন স্থানে থাকে— কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে সবার কাছে।

বনহুর সম্মুখে, পিছনে রহমান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে।

এক সময় বললো রহমান— সর্দার, কাপালিকটাকে আপনি কি করে আটকে রাখলেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আজ নয়, পরে সব বলবো রহমান। হাঁ, এইটুকু শুনে রাখো, আমি কাপালিকের সন্ধান পেয়েছি।

সত্যি সর্দার!

তা না হলে তাকে কি করে কাল নরহত্যা থেকে ক্ষান্ত রাখতে সক্ষম হলাম, বলো?

রহমান ভুলে গেলো সকল মান-অভিমান। সে নীরবে সর্দারকে অনুসরণ করলো।

হাউবার্ডের ক্যাবিনে এসে রহমান অবাক হলো— বেচারী হাউবার্ড শয্যায় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। চোখমুখ তার চুপষে বসে গেছে যেন। বনহুর আর রহমানকে দেখে খুশি হলো হাউবার্ড, শয্যা ত্যাগ করে বললো— বসুন, বসুন আপনারা।

বনহুর আর রহমান আসন গ্রহণ করলো।

হাউবার্ড বসলো তাদের পাশে, নিজের বুকে হাত বুলিয়ে বললো— ভাগ্যিস, আপনারা ছিলেন তাই আমার কতকটা সাহস। কাপালিক বেটার ভয়ে আমার বুকটা জ্বালা করছে!

বনহুর বললো— কাপালিক বেটার ভয়ে বুক জ্বালা করছে না ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে মিঃ হাউবার্ড?

জ্বালা, বড্ড জ্বালা করছে। কেমন যেন অস্তস্তি বোধ করছি মিঃ সোহেল।

বনহুর বললো এবার— অস্বস্তির কোনো কারণ নেই। আজ কাপালিক আসবে না কারণ সে নরহত্যার নেশায় দ্বীপের বাইরে কোথাও গমন করবে।

হাউবার্ডের মুখ খুশিতে দীপ্তময় হলো, জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে— সত্যি বলছেন, আমার হোটেলে সে তো আর হানা দেবে না?

সে কথা আমি সঠিক বলতে পারছি না যদিও,তবু আমার মনে হয়, সে আজ বাইরে কোথাও দূরে গমন করে তৃপ্তির সঙ্গে রক্ত পানের নেশায় মেতে উঠবে.....

হাঁ, সত্যি রক্তপানে কাপালিক বেটা অফুরন্ত তৃপ্তি পায়। সেকি পরম তৃপ্তি.....বুকে হাত বুলায় হাউবার্ড।

বনহুর হেসে বলে— আপনি আমার বন্ধু মিঃ রুহেলের সঙ্গে গল্প করুন, আমি এক্ষুণি আসছি। মিস্ এলিন আছে না তার ক্যাবিনে?

হাঁ আছে। মেয়েটা আমার বড় ভড়কে গেছে এই কাপালিক বেটার ভয়ে।

তা তো যাবারই কথা। আপনি পুরুষ মানুষ হয়ে কাপালিকের ভয়ে কুঁকড়ে গেছেন আর সে তো মেয়েমানুষ.....আচ্ছা, আপনারা, আলাপ করুন আমি আসছি। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বলে—একসঙ্গে যাবো। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ অপেক্ষা করো।

বনহুর রহমানের জবাবের প্রতীক্ষা না করে বেরিয়ে যায়।

রহমান উসখুস করতে থাকে। মিঃ হাউবার্ডকে তার মোটেই ভালো লাগে না, কেমন যেন হাবা হস্তথস্ত মানুষটা এই মিঃ হাউবার্ড। তবু কি করবে, কথা না বলে তো কোনো উপায় নেই। রহমান বললো এবার— মিঃ হাউবার্ড?

আমাকে বলছেন মিঃ রুহেল?

হাঁ, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো?

করুন। আঃ, কি জ্বালা.....উঃ কি জ্বালা.....

রহমান থতমত খেয়ে বললো—জ্বালা? কিসের জ্বালা?

এই বুকে.....

আপনার বুকে জ্বালা আছে?

হাঁ, অত্যন্ত জ্বালা.....হাউবার্ড তার বিশাল বুকে হাত বুলোতে লাগলো।

রহমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলো তার বিরাট বপুখানার দিকে।

হাউবার্ডের অস্থিরতা দেখে মায়া হলো রহমানের। বেচারী কোনো দারুণ একটা কষ্টে ভুগছে বলেই মনে হলো তার। বললো রহমান— আপনাকে বড় অসুস্থ মনে হচ্ছে.....

না না, আমি অসুস্থ নই মিঃ রুহেল, অসুস্থ আমি নই। বলুন আপনি কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন, বলুন?

আপনার মেয়ে এলিন সম্বন্ধে একটা কথা আপনাকে বললো.....

আমার মেয়ে এলিন সম্বন্ধে আপনার মনে বুঝি সন্দেহ হচ্ছে?

হঠাৎ মিঃ হাউবার্ডকে এই প্রশ্ন করতে দেখে হকচকিয়ে গেলো রহমান। লোকটা জ্যোতিষী নাকি? তার মনের কথা বলে বসলো কি করে? তাড়াতাড়ি বললো রহমান— না না, সন্দেহ আমি মোটেই করি না.....

আবার রহমানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো মিঃ হাউবার্ড— আপনি মুখে একথা অস্বীকার করলে কি হবে, ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই আপনি খুব অবাক হয়েছেন। তা হবারই কথা— অনেকেই এমনিভাবে সন্দেহ করে, আর আপনি করবেন না কেন?

রহমান কিছু বলতে পারলো না বা বলবার মত সুযোগই পেলো না। হাউবার্ড বলে চললো আমার সঙ্গে মেয়ের চেহারা আকাশ-পাতাল তফাৎ— এটা শুধু আপনি কেন, অনেকেই সন্দেহ করেন।

এতোক্ষণে রহমান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, বললো— হাঁ হাঁ, আমিও ঐ রকম সন্দেহ করছিলাম। সত্যি, এলিন আপনার মেয়ে...

বলে মনে হয় না, এই তো?

ঢোক গিলে বললো রহমান— হাঁ, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম...

আমার নিজের মেয়ে কিনা?

মাথা দুলিয়ে বললো রহমান— হাঁ।

শুনুন আমি বলছি। সোজা হয়ে বসলো হাউবার্ড।

রহমান একটু নড়েচড়ে বসলো ভালো হয়ে।

হাউবার্ড আবার বুকে হাত বুলোতে লাগলো। মনে হলো বুকের ভিতরে তার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। একটু কেশে বললো— এলিন সত্যি আমার মেয়ে

নয়। ওকে আমি বিদেশ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। বড় সুন্দর কন্যা, তাই ওকে তাড়িয়ে না দিয়ে মেয়ে বলে গ্রহণ করেছি। আপনার কেমন লাগে ওকে?

আমার? রহমানের মুখ যেন রাগে লাল হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললো— খুব ভালো লাগে।

আপনার বন্ধু মিঃ সোহেল ওকে বড় ভালোবাসেন।

হুঁ, বাসেন।

আপনার সঙ্গে বুঝি বেশি ভাব জমে উঠেনি ওর?

আমার বন্ধুর সঙ্গে ভাব জমেছে সেটাই ভালো। আচ্ছা চলি আমি, কেমন? উঠে দাঁড়ায় রহমান।

হাউবার্ড বলে— আসুন তাহলে।

আসবো না— যাচ্ছি। আমার বন্ধু এলে বলবেন আমি হোটেলে চলে গেছি।

বলবো, বলবো.....আপনার বন্ধু বুঝি এখনও এলিনের ক্যাবিনে...

হাঁ, চলি। রহমান বেরিয়ে যায়।

এলিনের ক্যাবিনের পাশ দিয়েই হোটেলে ফিরে যাবার সিঁড়ির মুখ। রহমান এলিনের ক্যাবিনের সম্মুখে আসতেই তার কানে গেলো ক্যাবিনের ভিতরে এলিনের হাসির সঙ্গে তার সর্দারের হাসিভরা গলার আওয়াজ।

রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেলো উপরে।

❑

বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো বনহুর।

রহমান তখন রাগে-ক্ষোভে ফোঁস ফোঁস করছে। বনহুর এসে কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়লো বিছানায়। একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে ধূম্ররাশি ত্যাগ করে চললো।

রহমানও বিছানায় বসে বসে আপন মনে কিছু চিন্তা করছিলো আর লক্ষ্য করছিলো সর্দারকে।

হঠাৎ বলে বসলো বনহুর— রহমান, আগের চেয়ে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছি, কারণ কাপালিকের সন্ধান আমি পেয়েছি।

রহমান বলে উঠলো— তাহলে তাকে এই মুহূর্তে হত্যা করছেন না কেন সর্দার?

সে কথাও আজ খুলে বলবো না রহমান, কারণ এতে আমাদের কোনো অমঙ্গল ঘটতে পারে।

তাহলে বলবেন না সর্দার। রহমান একটু অভিমানভরে বললো কথাটা। অবশ্য অভিমান হবার কথাই বটে। সর্দারের পার্শ্বসহচর রহমান। এমন কিছু কথা নেই যা সর্দার তার কাছে গোপন রাখে। আজ কি হয়েছে সর্দারের তাই তাকে বলেই নিশ্চিন্ত হচ্ছে সে।

বনহুর রহমানের অভিমানভরা কণ্ঠে হাসলো মাত্র, তারপর বললো— রহমান, আজ রাতে আমরা দূরে এক স্থানে যাবো, কাজেই রাতে বিশ্রাম হবে না, তুমি এই সময় বিশ্রাম করে নাও।

কথাটা বলে বনহুর পাশ ফিরে শয়ন করলো।

অনেক পরে ঘুম ভাংলো বনহুরের। জেগে দেখলো রহমান বিছানায় নেই। কলিং বেলে চাপ দিতেই বয় ছুটে এলো—স্যার, কি চাই?

আমার বন্ধু মিঃ রুহেল কোথায়?

বয় বললো—তঁকে মিস এলিনের ক্যাবিনের দিকে যেতে দেখেছি।

ভ্রু কুঁচকে বললো বনহুর— মিস এলিনের ক্যাবিনের দিকে যেতে দেখেছো তাকে?

হাঁ স্যার।

আচ্ছা যাও।

চলে গেলো বয়।

বনহুর দ্রুত গায়ে জামাটা পরে নিয়ে নিচে নেমে গেলো সিঁড়ি বেয়ে। এলিনের ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়াতেই বনহুর শুনতে পেলো রহমানের গলার স্বর— মিস্ এলিন, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমার বন্ধুর সর্বনাশ করবেন না। তাকে আপনি জড়াতে চেষ্টা করবেন না.....

বনহুরের মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কঠিন কণ্ঠে বললো—, রহমান, তুমি এখানে কেন?

চমকে উঠলো রহমান, মাথা নত করে দাঁড়ালো সে অপরাধীর মত, কোনো জবাব দিতে পারলো না বা চোখ তুলে তাকাতে পারলো না রহমান সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো— রহমান, চলো আমার সঙ্গে।

বনহুর একবার এলিনের দিকে তাকিয়ে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

রহমান তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর নিজের কক্ষে প্রবেশ করে পায়চারী করতে লাগলো।

রহমান এসে দাঁড়ালো একপাশে, মুখখানা তার লজ্জাবনত হয়ে আছে।

বনহুর পায়চারী বন্ধ করে বললো— রহমান, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো?

রহমান চোখ তুলে তাকালো কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

বনহুর আবার বললো— বলো, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো কিনা? সঠিক জবাব দাও রহমান?

রহমান যেন বোবা বনে গেছে।

বনহুর এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, বললো— তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে কোনোদিন ভাবতে পারিনি রহমান। তাছাড়া আমি চাই না, তুমি আমাকে কোনোরকম সন্দেহ করো।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো রহমান— সর্দার, আমাকে ক্ষমা করুন।

রহমান, তুমি যতই সাবধানতার সঙ্গে আমাকে অনুসরণ করছো কিন্তু আমার চোখে তুমি ধূলো দিতে পারোনি। কেন তুমি আমাকে সন্দেহ করো বলোতো?

রহমান জীবনে সর্দারের কাছে এমনভাবে কোনোদিন অপদস্থ হয়নি, আজ যেন সে একেবারে মাটিতে মিশে গেলো।

বনহুরের গলার আওয়াজ নরম হয়ে এসেছে, বুঝতে পারলো রহমান সর্দার তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তবু সে চোখ তুলতে পারছিলো না।

বলবো আবার বনহুর— আমি প্রথমই বলেছি, সব তোমাকে পরে বলবো। যাও, তৈরি হয়ে নাও, সন্ধ্যার পূর্বেই বের হবো।

রহমান যেন এ যাত্রা বেঁচে গেলো, তাড়াতাড়ি সরে পড়লো সে বনহুরের সম্মুখ থেকে।

❑

বনহুর আর রহমান ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। কোচওয়ান বললো— আপনারা এখানে কি করবেন স্যার? এ জায়গা মোটেই ভাল নয়। তাছাড়া আপনারা সন্ধ্যার আগে এখান থেকে ফিরতেও পারবে না। কারণ একটু পরে সব যানবাহন বন্ধ হয়ে যাবে।

বনহুর পকেট থেকে টাকা বের করে কোচওয়ানের হাতে দিয়ে বললো— আমাদের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না ভাই। এবার তুমি যেতে পারো।

কোচওয়ান গাড়ি নিয়ে চলে গেলো।

সন্ধ্যা হবার এখনও বেশ কিছু সময় বাকি আছে। বনহুর আর রহমান এখন যে জায়গায় নেমে দাঁড়ালো এটা মরিলা দ্বীপের বনাঞ্চলের এক অংশ। পথের ওপাশেই ঘন জঙ্গল। এই পথেই বনহুর আর রহমান প্রথমদিন একটা মুন্ডহীন নরদেহের সঙ্গে হোঁচট খেয়েছিলো। আজ আর দেহটা পথে পড়ে নেই, হয়তো পুলিশ মহল লাশটাকে সরিয়ে ফেলেছে, নয় শিয়াল-কুকুরে ভক্ষণ করেছে।

রহমান বললো—সর্দার, ঐ দেখুন একটা লোক এগিয়ে আসছে।

বনহুর কিছুমাত্র অবাক না হয়ে বললো— হয়তো কোনো পথচারী হবে। কিন্তু বেচারীর এই শেষ সূর্যাস্ত।

তার মানে।

মানে কাপালিক হস্তে মরবে।

সর্দার!

হাঁ, আমি জানি, এই মুহূর্তে সে আর ফিরে যেতে পারবে না এখান থেকে।

সর্দার আমরা-------

আমাদেরও আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

তাহলে...

কাপালিক-হস্তে মৃত্যুও ঘটতে পারে রহমান। কিন্তু যাতে মরতে না হয় সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। লোকটা আসছে এদিকেই, না?

হাঁ সর্দার। ওকেও আমরা সঙ্গে নিতে পারি কি?

না রহমান, ওটা কাপালিকের আজকের শিকার।

সর্দার!

এসো আমার সঙ্গে, লোকটা যেন আমাদের দেখে না ফেলে, বুঝলে? এসো, ঐ মোটা গাছটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ো।

বনহুর আর রহমান পথের ধারে বড় একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

লোকটা একটি থলে হাতে এগিয়ে আসছে। লোকটার চোখমুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না তবুও বেশ বুঝা যাচ্ছে, সে অত্যন্ত ভড়কে গেছে। চারিদিকে ভীত নজরে তাকাচ্ছে লোকটা আর এগুচ্ছে এক পা দু'পা করে।

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো— রহমান, কাপালিক আজ এরই রক্ত পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে।

সর্দার, আপনি কি করে জানতে পারলেন এই গভীর রহস্যময় কথাটা?

জানতে পেরেছি, নিজের কানেই শুনেছিলাম আজ এই লোকটা আসবে এখানে। আর কাপালিক তাকে হত্যা করে রক্ত পান করবে। বেচারীকে অর্থের লোভ দেখিয়ে এখানে আনা হয়েছে।

বলেন কি সর্দার?

হাঁ, কাপালিক অতি বুদ্ধিমান নররক্ত পানকারী পিশাচ। রহমান, লোকটা সরে গেলেই এই গাছে আমরা চেপে বসবো এবং এখান থেকেই আমি কাপালিককে জীবনের মত রক্ত পানের নেশা থেকে পরিত্রাণ দেবো...আর বিলম্ব করোনা রহমান, চেপে বসো।

রহমান গাছটার গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসেনি। রহমান গাছের একটা সুউচ্চ ডালে বসে সর্দারের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

বনহুর ছোটবেলা হতেই গাছে চড়ায় দক্ষ ছিলো, কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না, রহমানের পাশে এসে একটা মোটা ডালে বসলো বনহুর। উভয়ের হস্তেই গুলীভরা রিভলভার।

লোকটা থলে হাতে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে।

রহমান ফিস্ ফিস্ করে বললো— সর্দার, লোকটা ঘাবড়ে গেছে রীতিমত।

হুঁ।

সর্দার, বেচারীকে কাপালিকের কবল থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া যায় না?

যায় না রহমান। কারণ ও মরবার জন্য এসেছে আজ। জানোই তো লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। অল্পক্ষণ স্থির হলে লক্ষ্য করো, সব আজ খোলাসা হয়ে যাবে তোমার কাছে। কাপালিকের মৃতদেহ দেখতে পাবে চোখের সম্মুখে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এলো। বেলা ডুবে গেলো পশ্চিমে।

লোকটাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু ছায়ার মত মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে লোকটার!

লোকটার জন্য বনহুরের মায়া হচ্ছে কিন্তু কোনো উপায় নেই। বাঘ শিকারের জন্য কাঠঘরার মধ্যে যেমন ছাগলছানা রেখে বাঘকে কাঠঘরায় বন্দী করা হয়, তেমনি বনহুর আর রহমান ওঁৎ পেতে বসে রইলো, লোকটাকে দিয়ে তারা শিকার করবে শয়তান নরখাদক কাপালিকটাকে।

বনহুর আর রহমান রিভলভার কোমরের বেল্টে খাপে রেখে পিঠে বাঁধা রাইফেল খুলে নিলো। কারণ রিভলভারের গুলী শেষ পর্যন্ত কাপালিকের নিকটে নাও পৌঁছতে পারে এবং সে কারণেই ওরা রিভলভার রেখে রাইফেলে গুলী ভরে তাক ঠিক করে রইলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয়ে এলো।

গাছে গাছে পাখীর কলরব থেমে এলো একসময়।

গভীর জঙ্গলের ধারে নির্জন পথে বেচারী লোকটা রোদন করতে শুরু করেছে। কোন্‌দিকে পালাবে, কোথায় যাবে, ভেবে পাচ্ছে না।

রহমান বললো—কি ভয়ঙ্কর জায়গা সর্দার!

তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই কাপালিক।

বনহুরের কথা শেষ হতে না হতে একটা গর্জন শোনা গেলো—হুম্ হুম্ হুম্... ...

লোকটা ছুটে পালাতে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করলো— কে কোথায় আছো বাঁচাও... বাঁচাও...

কালো হাতির মত একটা কিছু এগিয়ে আসছে লোকটার দিকে। লোকটা প্রাণপণ চেষ্টায় উঠিপড়ি করে দিলো দৌড় কিন্তু পারলো না, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে কালো অসুরের মত দেহটা ঝুকে পড়লো লোকটার দেহের উপর। লোকটা গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুঁড়লো।

রহমানও গুলী ছুঁড়লো তার রাইফেল থেকে।

বনভূমি প্রকম্পিত দেহটা পূর্বের মতই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পথ এবং জঙ্গলাভূমি বেশ ঘন অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো, তাই স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো না কিছু।

রহমান বললো—সর্দার, কি হলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?

হতাশ কণ্ঠে বললো বনহুর—আমরা ব্যর্থ হয়েছি!

লোকটার কি হলো সর্দার?

অর্থ গ্রহণ করতে এসে মুন্ডটা দান করে গেলো।

লোকটা মারা পড়েছে তাহলে?

দেখছো না আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

কাপালিক আর আসবে বলে মনে হয় না।

বলাও যায় না, আসতেও পারে। রহমান, আজ সমস্ত রাত আমাদের এখানেই এই গাছের উপরে কাটাতে হবে।

আমার কোনো কষ্ট হবে না সর্দার।

বেশ, তাহলে নিশ্চিন্তে বসো। কাপালিক হত্যায় আজও আমরা ব্যর্থ হলাম।

❑

পরদিন যখন বনহুর আর রহমান ফিরে এলো তখন হোটেলে এক মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। সবাই বলছে, মিঃ সোহেল আর মিঃ রুহেল গত রাতে কাপালিক হস্তে মৃত্যুবরণ করেছে। শুধু তারাই নয়, হোটেল থেকে আরও একজন নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু এখনও তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

মিঃ সোহেল আর মিঃ রুহেল হোটেলে পৌঁছতেই মিঃ হাউবার্ড উঠিপড়ি করে ছুটে এলো, তার চোখেমুখে অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছে। বারবার বনহুর আর রুহেলকে বুকে জাপটে ধরে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো, কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো— কেমন আছে তারা, কোথায় গিয়েছিলো তারা।

বনহুর হেসে বললো— শিকারে গিয়ে হঠাৎ একস্থানে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, সত্যি এ জন্য আমরা লজ্জিত।

মুখ গম্ভীর করে আদরমাখা কণ্ঠে বললো হাউবার্ড— হঠাৎ যদি কোনো বিপদ ঘটতো তাহলে কি হতো? এমনি তো হোটেলে কাপালিক বেটা বদনামের জয়টিকা পরিয়ে গিয়েছে। আজ আবার তোমরা তিনজন উধাও হয়েছিলে— দু'জন ফিরে এলে, আর একজনের এখনও ফিরে আসার কোনো লক্ষণ দেখছি না।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো— মিঃ হাউবার্ড, আর সে ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।

এ তুমি কি বলছো সোহেল?

হাঁ, সত্যি বলছি।

হাউবার্ড মাথায় হাত দিয়ে একটা সোফায় ধপ্ করে বসে পড়লো, তারপর আপন মনেই বলে উঠলো— লোকগুলো বেহায়াপনা করে হোটেলের বাইরে যাবে আর বিপদে পড়বে— বদনাম হবে আমার হোটেলের। হায় হায়, কাপালিক বেটার জন্য আমার হোটেলের চরম দুর্দশা হবে দেখছি। শোন সোহেল, তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরা আর কখনও বাইরে যাবে না! হাঁ, আরও একটা কথা শোন, আমি এখন থেকে তোমাদের দু'জনকে 'তুমি' বলবো, কেমন?

বনহুর হেসে বললো— নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এতে আমরা খুশিই হবো। কারণ আপনি আমাদের পিতার বয়সী কিনা।

ঠিক বলেছো, তোমরা আমার সন্তানের মত... ...

সেই কারণেই তো আমাদের জন্য আপনার দরদের সীমা নেই।

তাতো বুঝতেই পারছো। সত্যি, তোমাদের এক মুহূর্ত না দেখলে মনটা আমার খা খা করে।

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে বললো— আজ আপনার বুকের জ্বালাটা কেমন আছে মিঃ হাউবার্ড?

মিঃ হাউবার্ড বুকে হাত বুলিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললো— অনেকটা ভাল আজ।

বনহুর ছোট একটি শব্দ করলো— হুঁ।

এবার বনহুর আর রহমান নিজেদের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। সমস্ত রাত অনিদ্রায় কেটেছে তাদের, কাজেই শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত-অবসাদ মনে হচ্ছে।

বনহুর বেশ করে স্নান সেরে নিয়ে কিছুটা খেয়ে শুয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙ্গলো প্রায় বেলা দুটো-আড়াইটায়।

রহমান ঠিকভাবে ঘুমাতে পারেনি, অবশ্য ঘুমোতে চাইলেও ঘুম তার চোখে আসে না। বিদেশ জায়গা, তাছাড়া সর্বক্ষণ বিপদ আপদের আশঙ্কা রয়েছে— কখন সর্দারের উপর কোন্ বিপদ ঘটে, এটাই তার একমাত্র চিন্তা। সর্দার জেগে থাকলে তার জন্য একটুও ভয় বা আশঙ্কা নেই। কারণ সে জানে, সর্দার তার চেয়ে অনেক জ্ঞান রাখে এবং শক্তিও তার চেয়ে অনেক বেশি।

বনহুর যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন রহমান সজাগ প্রহরীর মত পাহারারত থাকে, এটা তার আজকের অভ্যাস নয়—বহুদিনের। কাজেই আজও বনহুর যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলো ততক্ষণ রহমান ঘুমায়নি।

রহমানের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। বার বার হাই তুলছে সে।

বনহুর বললো— রহমান তুমি ঘুমাওনি?

রহমান নীরব রইলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, রহমান অন্যান্য দিনের মত আজও ঘুমায়নি। বললো বনহুর— যাও ঘুমিয়ে নাও রহমান, আজ রাতেও হয়তো ঘুমাবার সময় পাবে না।

রহমান চলে গেলো নিজের ক্যাবিনে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লো।

মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। এবার বনহুর ড্রেস পরে সজ্জিত হয়ে নিলো। হোটেলের ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকালো বনহুর নিজের চেহারার দিকে। সত্যি, তাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে! একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

এলিনের দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু টোকা দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো, বেরিয়ে এলো এলিন। শরীরে তার স্নানের ড্রেস। এলিন বোধ হয় বাথরুমে ছিলো, দরজায় শব্দ পেয়ে চলে এসেছে সেই ভাবেই।

এলিনের সুঠাম দেহের প্রায় সমস্ত অংশই খোলা রয়েছে, সামান্য আবরণ দ্বারা দেহের কিছু কিছু অংশ ঢাকা। বনহুর চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুর এলিনের যৌবনভরা সুঠাম দেহটার দিকে। পরক্ষণেই হুঁশ্ হলো, এমন সময় আসাটা বোধ হয় সমীচীন হয়নি তার।

বনহুর দৃষ্টি নত করে নিয়ে বললো— ক্ষমা করো এলিন, আমি ভুল করে এসে গেছি, এখনই যাই...

এলিনের দু'চোখে তখন মায়াময় চাহনি, দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো এলিন বনহুরের হাত দু'খানা, তারপর বললো— এসো...ভিতরে এসো...

মন্ত্রমুগ্ধের মত বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো।

এলিন বনহুরকে বসিয়ে দিলো একটা সোফায়। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো তার গলা। বনহুর ধীরে ধীরে এলিনের হাত দু'খানা সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

এলিন বললো— মিঃ সোহেল, কি খাবেন বলুনতো?

বনহুর দাঁড়িয়েই বললো— তোমার যা খুশি আমাকে দিতে পারো।

এলিন পাশের কামরায় প্রবেশ করলো, একটা বিলেতী মদের বোতল আর গেলাস্ হাতে ফিরে এলো।

বনহুর হেসে বললো— স্নান সেরে এসো, আমি বসছি এলিন।

না, তোমাকে রেখে আমি যাবো না...এলিন বনহুরকে এই প্রথম 'তুমি' বলে সম্বোধন করলো।

বনহুর এলিনের হাত থেকে মদের বোতল আর গেলাসটা নিয়ে টেবিলে রাখলো, তারপর টেপ্‌রেকর্ড চালু করে দিলো।

এলিন এবার যাদুমন্ত্রের মত বাজনার তালে তালে ব্যালে নৃত্য শুরু করলো।

বনহুর গেলাসে খানিকটা বিলেতী মদ ঢেলে এগিয়ে এলো এলিনের পাশে।

এলিন তখন সুন্দর ভঙ্গীমায় নাচতে শুরু করেছে, নাচের তালে তালে দুলছে তার দেহ-পল্লবখানা। সাধারণত এলিন বলড্যান্স আর ব্যালে নৃত্যে পারদর্শী ছিলো।

বনহুরের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে গলায় ঢেলে দিলো ঢক্ করে, তারপর গেলাসটা ছুঁড়ে দিলো বনহুরের দিকে।

বনহুর গেলাসটা নিয়ে টেবিলে রাখলো।

এলিন নেচে চলেছে।

অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গীমায় নাচছে সে। যদিও এলিনের দেহে তখন স্নানের ড্রেস তবু সে কোনো সঙ্কোচ বা দ্বিধা করছে না। কারণ এসব পোশাক তাদের কাছে মোটেই আপত্তিজনক নয়।

বনহুর পুনরায় আর এক গেলাস মদ ঢেলে এগিয়ে ধরে এলিনের সামনে— নাও এলিন, পান করো।

এলিন তখনও বাজনার তালে তালে হাত দু'খানা আর মাজাটা বিশেষ ভঙ্গীমায় দোলাচ্ছে।

সত্যিই আজ বনহুর যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, এলিনের দিক হতে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না সে।

গেলাসটা এলিন গ্রহণ করলো বনহুরের হাত থেকে, তারপর এক নিশ্বাসে পান করে গেলাসটা ছুঁড়ে দিলো টেবিলটার দিকে।

বনহুর গেলাসটা ধরবার পূর্বেই মেঝেতে পড়ে সশব্দে ভেঙ্গে গেলো খান খান হয়ে।

খিল খিল করে হেসে উঠলো এলিন।

বনহুর বুঝতে পারলো—নেশা ধরে গেছে এলিনের। সে এবার ধরে ফেললো এলিনকে।

এলিনের দেহটা তখন নাচের তালে তালে টলছিলো। না জানি কোন্ মুহূর্তে পড়ে যাবে ভূতলে। বনহুর এলিনকে ধরে ফেলতেই এলিন জড়িয়ে ধরলো বনহুরকে। বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো—আর নাচতে পারছি না বন্ধু---

বনহুরের হাতের উপর ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ছে এলিনের দেহটা।

বনহুর এলিনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো—আর নাচবে না এলিন?

হাঁ, আরও নাচবো। আরও নাচবো আমি---

রহমান কখন যে এসে পড়েছিলো নিচে, বাজনার আওয়াজ পেয়ে সোজা সে এলিনের ক্যাবিনের দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ রহমানের দৃষ্টি চলে যায় ভিতরে।

বনহুর বা এলিন দরজা বন্ধ করে দেবার কথা সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলো, তাই রহমানের দৃষ্টিপথে কোনো বাধা পড়ে না। তার সর্দারের হাতের উপর এলিনের নগ্নদেহ—রহমান মুহূর্তে সরে আসে সেখান হতে।

ফিরে আসে রহমান নিজের কামরায়। কিছুতেই রহমান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আজ যা দেখলো এটা কি সত্য? সত্যি কি তার সর্দার এতো অধপতনে গেছে। যত ভাবছে রহমান ততই যেন একেবারে রাগে-ক্ষোভে অধীর হয়ে পড়ছে সে। নিশ্চয়ই ঐ এলিন তার সর্দারকে যাদু করেছে---

রহমান যখন বনহুরকে নিয়ে গভীরভাবে ভেবে চলেছে তখন বনহুর এলিনকে প্রশ্ন করে চলেছে—এলিন, আমি তোমার, বলো কি চাও তুমি?

এলিনের জড়িত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হয়—সোহেল, আমি শুধু তোমাকে চাই। শুধু তোমাকে তবে বলো কে, কে সেই কাপালিক?

না না, ও কথা আমি বলবো না।

তাহলে আমিও চলে যাবো তোমার কাছ থেকে। আর কোনোদিন আসবো না। বলো এলিন, কে সেই নর রক্তপিপাসু কাপালিক?

আমি জানি না।

তুমি জানো। তুমি জানো এলিন কে সেই নরঘাতক?

আমি জানলেও বলবো না। সে আমাকে হত্যা করবে।

তোমাকে আমি রক্ষা করবো এলিন।

পারবে না। আমাকে তার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না সোহেল।

এলিন, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে বাঁচাবো।

সত্যি, পারবে আমাকে বাঁচাতে? যদি পারো তাহলে---

কথা শেষ হয় না এলিনের, পিছনে এলিনের বাবা হাউবার্ড এসে দাঁড়ালো—তোমরা এখানে।

বনহুর তাড়াতাড়ি এলিনকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ হাউবার্ডের আগমনে চমকে উঠেছে বনহুর।

এলিন তো মদের নেশায় চুর হয়ে পড়েছে।

হাউবার্ড বললো—ওকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দাও। নাহলে এক্ষুণি পড়ে যাবে।

বনহুর নির্বিকারভাবে হাউবার্ডের আদেশ পালন করলো। যদিও হাউবার্ডের সম্মুখে এলিনের নগ্নদেহটা স্পর্শ করতে বাধছিলো তার তবু কতকটা বাধ্য হয়েই এলিনকে ধরে শুইয়ে দিলো বিছানায়।

হাউবার্ড ততক্ষণে এলিনের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেছে বাইরে। হোটেলের সিঁড়িতে শোনা গেলো তার পায়ের শব্দ। বনহুর এলিনের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওর চোখ দুটো মুদে গেছে।

পরবর্তী বই

কাপালিক ও দস্যু বনহুর

কাপালিক ও দস্যু বনহুর— ৪৪

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

আরও কয়েকদিন কেটে গেলো, এবার হোটেলেই নরহত্যা শুরু হয়েছে। প্রতিদিন একটি নয়, তিন-চারটি মস্তকহীন লাশ হোটেলের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়।

পুলিশফোর্স সতর্ক পাহারা থেকেও এই নরহত্যার কোনোই হদিস খুঁজে পেলো না।

বনহুর পূর্বের চেয়ে আরও গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

রহমান ভেবে পায় না তার সর্দার হঠাৎ এমন শান্ত আর গম্ভীর হলেন কেন।

হোটেলের জনসংখ্যা কমে গেছে একেবারে।

রহমান ভীত আতঙ্কগ্রস্ত, না জানি কোন্ মুহূর্তে তাদের দেহ থেকেও মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কে জানে! একদিন রহমান বনহুরকে বললো—সর্দার, এ হোটেল ত্যাগ করাই এখন আমাদের পক্ষে সমীচীন। বাইরে কোথাও থেকে কাপালিকের সন্ধান করলে হয় না কি?

বনহুর সিগারেট পান করছিলো, বললো—প্রাণ বাঁচানোর জন্য অন্যত্র গমন করা আমাদের শোভা পায় না রহমান। তুমি ভেবে দেখো, এতোগুলো লোক প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে আর আমরা এদের ছেড়ে দূরে সরে যাবো! কাপালিক আর বেশিদিন নরহত্যা করবার সুযোগ পাবে না।

সর্দারের কথায় রহমান সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না, কারণ সে এই ক'দিনে বিশেষভাবে বুঝতে পেরেছে— কাপালিক শুধু ভয়ঙ্করই নয়, সে নররাক্ষসের চেয়েও সাংঘাতিক।

সেইদিন গভীর রাতে রহমান হঠাৎ জেগে উঠলো, পাশে নজর পড়তেই চমকে উঠলো বিস্ময়ে—সর্দার নেই, বিছানা শূন্য!

রহমান এই ক'দিনে রাতে একটি বারের জন্যও ঘুমাতো না, সে সব সময় জেগে থাকতো সতর্কভাবে। তার সদা-সর্বদা আতঙ্ক সর্দারকে নিয়ে। কখন সর্দার একা ক্যাবিন ত্যাগ করে বেরিয়ে যাবে আর তাকে হত্যা করে বসবে কাপালিক পাষণ্ড।

রহমান তাই এক মুহূর্তের জন্য রাতে নিদ্রা যেতো না কিংবা বিশ্রাম পায় শয্যা গ্রহণ করতো না।

সর্দারকে লক্ষ্য রাখাই ছিলো রহমানের মূল উদ্দেশ্য, যদিও সে নিজে সর্দারকে কাপালিক হত্যার জন্যই মরিলা দ্বীপে নিয়ে এসেছে; তবুও সে কেমন যেন সদা আগলে রাখতে চাইতো সর্দারকে।

রহমানের মনোভাব বুঝতে পেরে একদিন হেসে বলেছিলো বনহুর—তুমি সব সময় আমাকে নিয়ে এতো ভাবো কেন রহমান?

রহমান বনহুরের কথায় জবাব দিয়েছিলো— সর্দার, কাপালিক হত্যা করতে এসে যদি আপনার কোনো কিছু ঘটে যায় তাহলে আমি কোন্ মুখ নিয়ে ফিরে যাবো কান্দাই, কোন্ মুখ নিয়ে আমি বৌ-রাণীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবো।

বনহুর রহমানের কথায় হো হো করে হেসে উঠেছিলো, তারপর হাসি থামিয়ে বলেছিলো— আজকাল তোমরা দেখছি বড্ড দুর্বলমনা হয়ে পড়েছো। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলো— রহমান, দস্যু বনহুর মরণকে কোনো সময় ভয় করে না। তুমি তারই প্রধান অনুচর, কাজেই তুমি নিজেও মরণের জন্য কোনো মুহূর্তে নার্ভাস হবে না।

রহমান কোনো জবাব দিতে পারেনি, মাথা নিচু করেছিলো সর্দারের কথায়।

আজ সর্দারের বিছানা শূন্য দেখেই আতঙ্কিত হলো রহমান। সে শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো। অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো সে বাইরে। তাকালো চারিদিকে, কোথাও কিছু নজরে পড়লো না। সর্দার হয়তো এলিনের কামরায় গেছে মনে করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললো রহমান। সমস্ত হোটেল নীরব নিস্তব্ধ, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই—লণ্ঠনগুলো টিমটিম করে জ্বলছে।

রহমানের দক্ষিণ হস্তে রিভলভার। অন্ধকারে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নিচে এসে পড়লো। এলিনের দরজায় এসে দাঁড়ালো সে, মৃদু চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো। অবাক হলো রহমান— কামরা শূন্য, এলিন কামরায় নেই! তার সর্দার কোথায় গেছে কে জানে!

আজ প্রথম রহমান এলিনের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। সুন্দর পরিচ্ছন্নভাবে ক্যাবিনখানা সাজানো। একপাশে একটি খাট, খাটের পাশেই টেবিল। টেবিলে খান কয়েক বই সুন্দর করে সাজানো। একটা ফুলদানীতে ফুল রয়েছে। একটা কাঁচের গেলাস আর একটা বোতলও রয়েছে ফুলদানীর পাশে রহমান স্পষ্ট বুঝতে পারলো, এলিন বা কেউ একটু পূর্বে এই ক্যাবিনে

মদ পান করেছো। গেলাসে এখনও মদের কিছুটা পড়ে রয়েছে দেখতে পেলো সে।

হঠাৎ রহমান ঝুঁকে গেলাসটা যেমন হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে ঠিক সেই মুহূর্তে কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠলো। মুখ ফিরাতেই অস্ফুট শব্দ করে উঠলো— সর্দার.....

তার পিছনে দণ্ডায়মান দস্যু বনহুর। দক্ষিণ হস্তে তার রিভলভার, বাম হস্তখানা রেখেছে রহমানের কাঁধে। রহমান অস্ফুট শব্দ করে উঠতেই বনহুর বাম হস্তের আংগুলখানা ঠোঁটের উপর রেখে চাপা স্বরে বললো — চুপ! এসো আমার সঙ্গে।

রহমান সর্দারকে অনুসরণ করলো।

বনহুরের দেহে জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর খানিকটা অংশ দিয়ে মুখের নিচের ভাগ ঢাকা রয়েছে। বনহুর নিঃশব্দে অগ্রসর হলো। ওপাশের দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়ালো এবার।

রহমান আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছে সর্দারকে।

দেয়ালের পাশে একটি মডেল দাঁড় করানো রয়েছে। একটি অর্ধ-উলঙ্গ নারীমূর্তি সেটা। বনহুর মডেলের দক্ষিণ হস্তে মৃদু চাপ দিতেই দেয়ালের সামান্য ফাঁকের সৃষ্টি হলো।

বনহুর সেই কিঞ্চিৎ ফাঁকে দৃষ্টি রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালো।

রহমান তখন সর্দারের মুখোভাব লক্ষ্য করছিলো। সে দেখলো, বনহুরের চোখমুখে দারুণ এক বিস্ময় ফুটে উঠেছে। অদ্ভুত হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো।

বনহুর এবার রহমানকে ইংগিত করলো সেই ফাঁকে দৃষ্টি রাখতে।

রহমান দেয়ালের ফাঁকে দৃষ্টি রাখতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলো যেন— ভয়ে-বিস্ময়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিলো, নিজের মুখে হাত-চাপা দিয়ে মৃদু স্বরে বললো— সর্দার, কি ভয়ঙ্কর...

বনহুর বললো— কাপালিক!

রহমান বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখছে, একটা বিরাট চেয়ারে বসে আছে রাক্ষসের মত এক বিরাটদেহী মানুষ। তার মুখে চোখে এক ভয়ঙ্কর ভাব ফুটে উঠেছে, সমস্ত মুখে লম্বা দাঁড়ি গোঁফ। ভ্রুগুলো ঝুলে পড়েছে চোখের উপর। দাঁতগুলো ঠোঁটের উপর বেরিয়ে আছে। সমস্ত দেহেও একরকম লম্বা খাড়া খাড়া চুল। হাত এবং পাগুলো যেন এক-একটা থামের মত মোটা।

কাপালিক দুলছে বসে বসে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো তারপর ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

রহমান ভয়ে-বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে, অস্ফুট কণ্ঠে বললো— সর্দার, কাপালিক বেরিয়ে গেলো.....

হাঁ রহমান, কাপালিক রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে, তাই সে রক্ত পান করতে গেলো।

সর্দার!

আজ সে হোটেলেই কাউকে হত্যা করে রক্ত পান করবে।

সর্দার আপনি.....

সব আমি জানি রহমান! চুপ করে দাঁড়াও, তারপর আরও জানতে পারবে।

রহমান দেয়ালের ফাঁকে দৃষ্টি রাখতেই বলে উঠলো— একি, এলিনকে দেখছি যে? ওর হাতে একটা সিরিঞ্জ দেখছি না?

হাঁ, সিরিঞ্জই বটে। চুপ করে দাঁড়াও রহমান, আজ সব তুমি নিজ চোখে দেখতে পাবে।

রহমান আর বনহুর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, দৃষ্টি তাদের দেয়ালের ফাঁকে পাশের কামরায় সীমাবদ্ধ।

এলিন সিরিঞ্জখানা নিয়ে কিছু যেন করছে বলে মনে হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ দমকা ঝড়ের মত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কাপালিক।

বনহুর বলে উঠলো— সর্বনাশ.....

বনহুরের কথা শেষ হয় না, কাপালিককে দেখবামাত্র এলিন আর্তনাদ করে উঠলো— আ! —সে কি প্রাণফাটা তীব্র চিৎকার!

রহমানের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

বনহুর আর রহমান দেখলো— কাপালিক কক্ষে প্রবেশ করেই এলিনকে ধরে ফেললো, সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বাঁধা খর্গখানা খুলে নিয়ে বসিয়ে দিতে গেলো এলিনের কণ্ঠদেশে কিন্তু সেই দণ্ডে বনহুর এলিনের কামরায় মডেলটার দক্ষিণ হস্তে খুব জোরে চাপ দিলো। মুহূর্তে দেয়ালের ফাঁকটা প্রশস্ত হয়ে গেলো। বনহুর রিভলভার হস্তে তীরবেগে প্রবেশ করলো সেই কামরায়।

এত দ্রুত বনহুর কাজ করলো যে, কাপালিকের খর্গ এলিনের কণ্ঠদেশ ছেদন করবার পূর্বেই সে কাপালিক আর এলিনের সম্মুখে এসে পরপর কয়েকটা গুলী ছুঁড়লো কাপালিকের বুক লক্ষ্য করে।

কাপালিক মুহূর্তে ফিরে দাঁড়ালো এবং সঙ্গে সঙ্গে খর্গ নিয়ে আক্রমণ করলো বনহুরকে।

রহমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, সর্দারের রিভলভারের গুলী কাপালিকের বক্ষে বিদ্ধ না হয়ে ঠিক্‌রে পড়লো তার চারপাশে— কি আশ্চর্য, কাপালিক একটুও টলবে না!

কাপালিক খর্গ নিয়ে বনহুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই বনহুর সরে দাঁড়ালো বিদ্যুৎগতিতে।

কাপালিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

বনহুর এবারও এরপর দুটো গুলী ছুঁড়লো কিন্তু একটুও কাবু হলো না কাপালিক। সে ভীষণ আকার ধারণ করে খর্গ তুলে ধরলো বনহুরের দিকে।

রহমান শিউরে উঠলো, হাতের পিঠে চোখ দুটো ঢেকে ফেললো সে। পরক্ষণেই রিভলভারের আওয়াজ পেয়ে রহমান চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলো— দেখলো সর্দার আর কাপালিকের ভীষণ ধস্তাধস্তি চলেছে। রহমান আরও লক্ষ্য করলো— কাপালিক হস্তে খর্গখানা নেই, হাতখানা ঝুলছে একপাশে, রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে কাপালিকের দেহটা।

এলিন এক পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার গোটা মুখমণ্ডল।

বনহুরকে ভূতলে ফেলে কাপালিক চেপে ধরলো তার গলা। এবার বনহুর মরিয়া হয়ে উঠলো, চোখ দুটো ঠিকরে বের হয়ে আসছে যেন।

কাপালিক তার হাত দু'খানা দিয়ে ভীষণভাবে চাপ দিচ্ছে বনহুরের গলায়। বনহুর তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে কাপালিকের হাত থেকে নিজের গলাটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছে।

রহমান বুঝতে পারলো, কাপালিকের হাত হতে সর্দার বুঝি এ যাত্রা রক্ষা পাবে না। রহমান তীব্র চিৎকার করে ছুটে এলো কক্ষমধ্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে এলিন তার হস্তস্থিত সিরিঞ্জে পাশের ক্যাবিন থেকে কিছু তরল পদার্থ পূর্ণ করে ছুটে এসে কাপালিকটার পিঠের বাম পাশে পুশ্ করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটে গেলো। কাপালিক তীব্র চিৎকার করে ঢলে পড়লো মেঝেতে।

তৎক্ষণাৎ বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

রহমান অস্ফুট শব্দ করে উঠলো— সর্দার!

বনহুর তাকালো রহমানের মুখে, তারপর এলিনের একখানা হাত চেপে ধরলো।

এলিন রীতিমত হাঁপাচ্ছে, ঘেমে উঠেছে ওর মুখমণ্ডল। ঢোক গিলে বললো— মিঃ সোহেল, ওকে আমি শেষ করে দিয়েছি। আর উঠতে পারবে না।

বনহুর আর রহমান তাকিয়ে দেখলো, কাপালিকটা দু'চোখ বড় বড় করে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। হাত-পা গুলো বলির পাঠার মত আছাড় খাচ্ছে ওর। রিভলভারের শব্দ সমস্ত হোটেলে ছড়িয়ে পড়লেও কেউ বাইরে বের হবার সাহসী হলো না। সবাই ভীত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যার যার ক্যাবিনে বসে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। কারো এতোটুকু সাহস নেই যে, বাইরে এসে দেখে কোথা থেকে এই গুলীর শব্দে আসছে। এ হোটেলের অভ্যন্তরেই যে কোথাও একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছে সবাই।

নিজ নিজ ক্যাবিনে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে চলেছে সকলে। এ ক'দিনে বহুলোক হোটেল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো। যারা অত্যন্ত অনুপায় তারাই রয়ে গিয়েছিলো হোটেলে।

মরিল দ্বীপ জুড়ে এই একটি মাত্র হোটেল। এই দ্বীপে যারা আগমন করে তারা প্রায় সকলেই আশ্রয় নেয় এই হোটেলে। কাপালিকের অত্যাচারে মরিলা দ্বীপবাসী যখন অস্থির তখন মরিলা দ্বীপের বাসিন্দা অনেকেই তাদের বাড়ি ঘর ত্যাগ করে এই হোটেলটিকে নিরাপদ স্থান মনে করে আশ্রয় নিয়েছিলো, কিন্তু এখানে এসেও তারা প্রাণ বাঁচাতে পারেনি, কাপালিক হস্তে অনেকেই জীবন দিয়েছে।

মরিলা দ্বীপবাসিগণ যখন অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছিলো— সন্ধ্যার পর একটি প্রাণীও যখন পথঘাটে চলাফেরা বন্ধ করে গৃহমধ্যে অতি সতর্কভাবে আত্মগোপন করেছিলো তখন দ্বীপে নরহত্যা কমে এসেছিলো অনেক পরিমাণে। কিন্তু হোটেলে বেড়ে গিয়েছিলো ভীষণভাবে।

ভয়ে হোটেল ত্যাগ করে পালাতে শুরু করেছিলো সবাই। এমনি এক রাতে এই ঘটনা ঘটলো মরিলা দ্বীপ হোটেলের নিচের গোপন এক কক্ষে।

ভয়ঙ্কর কাপালিকের-দেহটা কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাড় নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো।

বনহুর বললো এবার—কাপালিক চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়লো, আর সে জাগবে না। যাও রহমান, হোটেলের সবাইকে সংবাদ জানিয়ে দাও এবং সবাইকে ডেকে আনো।

রহমান যেন একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, কাপালিকের দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে সে বোবাদৃষ্টি মেলে। সর্দারের কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় সে, বলে—সর্দার, কাপালিকটা সত্যি মরলো?

হাঁ, সত্যি কাপালিক মৃত্যুবরণ করেছে। সে আর নররক্ত পান করবার জন্য নরহত্যায় প্রবৃত্ত হবে না।

রহমান বেরিয়ে যায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হোটেলের নিম্নতলায় সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়ায়। সকলের মুখেই একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে—ভয়-ভীতি আর আনন্দ নিয়ে সকলে ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয়। সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে—কাপালিক মৃত্যুবরণ করেছে, এ যেন এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ালো কক্ষটার মধ্যে।

বনহুর সবাইকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা এখন নিশ্চিন্ত। কাপালিক আর আপনাদের হত্যা করতে আসবে না।

সকলে একসঙ্গে আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

বনহুর বললো—আজ আপনারা বিপদমুক্ত হলেন, এজন্য মিস এলিনকে ধন্যবাদ দিন। তিনিই ঐ কাপালিক-দেহে বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ্ করে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

এলিনের হাতে তখনও সিরিঞ্জটা ধরাই ছিলো, সে বলে উঠলো—কাপালিক হত্যা ব্যাপারে আমার চেয়ে মিঃ সোহেল বেশি ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। এই বিষাক্ত ইনজেকশন তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন এবং কিভাবে এটা কাপালিক দেহে পুশ্ করতে হবে তাও তিনিই আমাকে নিপুণভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আজ আমি এই নরখাদক কাপালিক হাত থেকে

উদ্ধার পেলাম। শুধু আমিই নই সমস্ত মরিলা দ্বীপবাসী এবং দ্বীপের আশেপাশের জনগণও এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার লাভে সক্ষম হলো।

রহমান স্তব্ধ নিশ্বাসে শুনছিলো এলিনের কথাগুলো। হোটেলের অন্য সকলেও বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলো আর এলিনের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলো মনোযোগ সহকারে। এবার হোটেলের ম্যানেজার বলে উঠলো— সবাইকে দেখছি কিন্তু মালিক কোথায়?

রহমানও বললো— তাইতো, হাউবার্ডকে দেখছি না তো?

সকলেই মিঃ হাউবার্ডের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

বনহুর বললো— আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, এক্ষুণি আপনারা আপনাদের হোটেলের মালিক হাউবার্ডকে দেখতে পাবেন।

সবাই অবাক হয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর বললো— আপনারা হয়তো অবাক হয়েছেন কাপালিক এখানে এলো কেমন করে? তাছাড়া এ-কক্ষটা আপনাদের কারো পরিচিত কক্ষ নয়। হোটেলের নিচে এটা অত্যন্ত গোপন কক্ষ। এই কক্ষটা হাউবার্ডের লেব্রটরী কক্ষ। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছেন, কক্ষের চারদিকে অনেক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। এগুলো অত্যন্ত মারাত্মক ওষুধ তৈরির সরঞ্জাম এবং মেসিনপত্র। হাউবার্ড দিনে এ ক্যাবিনে কোনো সময় প্রবেশ করতেন না, তিনি গভীর রাতে এই ক্যাবিনে প্রবেশ করে লেব্রটরীর কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। এমন একটা ওষুধ তিনি তৈরি করেছিলেন যা মানুষের দেহে পুশ্ করে দেবার কয়েক মিনিট পর মানুষটি অদ্ভুত শক্তি লাভ করতো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আকার দেহের দেড়গুণ বেড়ে যেতো। আর একটি নেশায় উন্মুক্ত হয়ে উঠতো সে—তা হলো রক্তের নেশা।

থামলো বনহুর।

কক্ষমধ্যেই সবাই স্তব্ধ নিশ্বাসে বনহুরের কথা শুনে যাচ্ছিলো। বললো বনহুর আবার—সেই মারাত্মক ওষুধ তৈরি নিয়ে মেতে উঠেছিলেন হাউবার্ড। তাকে বাধ্য হয়ে সহযোগিতা করতে হতো তার কন্যা মিস এলিনকে। আপনারা অনেকেই জানেন না, মিস এলিন হাউবার্ডের আপন কন্যা নয়। তাকে কোনো দূরদেশ থেকে চুরি করে আনা হয়েছিলো। এই তরুণীটিকে তিনি সত্যি স্নেহ করতেন, এবং তাকে দিয়েই তার ঐ মারাত্মক ওষুধ নিজ শরীরে পুশ্ করিয়ে নিতেন---

বনহুরের কথার মধ্যেই সবাই অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি করে উঠলো, মিঃ হাউবার্ডই তাহলে---

বনহুর স্থিরকণ্ঠে বললো—হাঁ, মিঃ হাউবার্ডই নররক্ত পান কারী ভয়ঙ্কর এই কাপালিক। কথাটা বলেই বনহুর ভুলুণ্ঠিত কাপালিকের মুখ থেকে টান দিয়ে একটা বিকট আকার মুখোস খুলে নিলো। তারপর দেহ থেকেও খুলে ফেললো একটা লোমশওয়ালা বর্ম। বনহুর বাম হস্তে মুখোস আর দক্ষিণা হস্তে বর্মটা উচু করে ধরে বললো—এই বর্ম পরে মিঃ হাউবার্ড কাপালিকের আকার ধারণ করে নরহত্যা এবং নররক্ত পান করে বুকের জ্বালা নিবারণ করতো।

কক্ষমধ্যে সবাই তখন নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে হাউবার্ডের প্রাণহীন বিরাট মোটা দেহটার দিকে। সকলের চোখেমুখে বিস্ময়। তারা নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

হোটেলের ম্যানেজার অত্যন্ত ভদ্র এবং মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাপালিকের ভয়ে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। না জানি কখন আবার হোটেলে কার দেহ থেকে মুন্ড বিচ্ছিন্ন হবে, এটাই ছিলো তার সবচেয়ে বড় চিন্তা।

কাপালিক নিহত হলো এবং সে আর কাউকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। এখন থেকে তার হোটেলই শুধু নয়, সমস্ত মরিলা দ্বীপবাসী নিশ্চিন্ত হলো। অনাবিল শান্তিতে ভরে উঠলো ম্যানেজার মিঃ কিউস্মিথের মন। তিনি বনহুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—মিঃ সোহেল, আপনার বুদ্ধি-কৌশলগুণেই আমরা এতবড় একটা ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম। আপনাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আর একটি কথা আমি বলছি, কাপালিক মিঃ হাউবার্ড যে লোকগুলোর মস্তকছিন্ন করে রক্ত পান করতো সেই মস্তকগুলো কোথায়?

বনহুর এবার এগিয়ে গেলো কক্ষটার পূর্বদিকের দেয়ালের পাশে, তারপর বললো—আপনারা এবার দেখতে পাবেন কাপালিক ছিন্ন মস্তকগুলো কোথায় জমা করে রেখেছিলো--সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের এক স্থানে একটি সুইচে হাত রেখে চাপ দিলো, অমনি দেয়ালটা সরে গেলো এক পাশে।

কক্ষমধ্যে সকলেই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো—সর্বনাশ, একি দেখছি--দু'হাতে কেউ কেউ চোখ ঢেকে ফেললো।

সবাই যেন জমে গেছে পাথরের মূর্তির মত। দেয়ালের ওপাশে স্তূপাকার নরমুন্ড জমা হয়ে আছে। কত লোককে এই হাউবার্ড হত্যা করেছে তার কোনো হিসাব নেই।

বনহুরের মনে পড়লো রাণী দুর্গেশ্বরীর কথা। সেও তার গোপন একটি কক্ষে বহু নরকঙ্কাল জমা করে রেখেছিলো। হয়তো এর পিছনে কোনো উদ্দেশ্য ছিলো যা তারা কেউ জানে না।

খবর পেয়ে পুলিশ সুপার এবং পুলিশ অফিসারগণ সবাই এসে হাজির হলেন মরিলা হোটেলে। কাপালিক নিহত হয়েছে জেনে তারা আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।

সব জানতে পারলেন তারা মিঃ সোহেলের কাছে। মিঃ হাউবার্ডই যে কাপালিক জেনে বিস্ময়ের সীমা রইলো না কারো। পুলিশ সুপার এবং অফিসারগণ সবাই হাউবার্ডের লাশ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

❑

মরিলা হোটেলকক্ষে বিশ্রাম করছে দস্যু বনহুর।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ তাকে সচ্ছ-স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। শয্যায় শয়ন করে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট পান করে চলেছে সে। মরিলা দ্বীপের কাজ তার শেষ হয়েছে, এবার তারা কান্দাই ফিরে যাবে।

রহমানও বসে ছিলো তার পাশে একটা আসনে। আজ তাকেও প্রসন্ন লাগছে। কাপালিক হত্যা ব্যাপার নিয়েই রহমান সর্দারকে এই মরিলা দ্বীপে এনেছিলো এবং যতক্ষণ কাপালিকটাকে হত্যা করতে না পেরেছিলো ততক্ষণ তার মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। আজ রহমানের বুক থেকে একটা পাষাণভার যেন নেমে গেছে।

বনহুর তার হস্তস্থিত সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে বালিশ টেনে উবু হয়ে শুয়ে পড়লো, তারপর বললো—রহমান, কাপালিক হত্যা-ব্যাপারে আমাকে অনেক বেখাপ্পা কাজ করতে হয়েছে যা তোমাকে বেশ কৌতুহলী করে তুলেছিলো, আর করেছিলো সন্দিহান।

থামলো বনহুর।

রহমান এতোক্ষণ নিশ্চুপ বসে আবোল তাবোল ভাবছিলো। সর্দার এ সময়ে তাকে নিজের বিশ্রাম ক্যাবিনে কেন ডেকেছেন তাও ভালভাবে বুঝতে পারছিলো না। বনহুরের কথায় সোজা হয়ে বসলো রহমান, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো সে সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—মিস এলিনের সহযোগিতা না পেলে আজ কাপালিক হত্যা কিছুতেই সম্ভব হতো না এবং এই নরহত্যা রহস্য উদ্ঘাটন হতো না। মিস এলিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে ওকে আয়ত্তে এনে তবেই আমি সব গোপন রহস্য জানতে পারি। জানতে পারি মরিলা হোটেলের মালিক মিঃ হাউবার্ডই কাপালিক।

রহমান বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে ছিলো বনহুরের দিকে, সে যেন সর্দারের কথাগুলো গিলছিলো একটির পর একটি করে।

বনহুর বলেই চলেছে—মিস্ এলিনের সঙ্গে আমাকে শুধু মিশতেই হয়নি, তার সঙ্গে আমাকে রীতিমত প্রেমের অভিনয় করতে হয়েছে। রহমান, আমি নিজের কাছে নিজেই অপরাধী, কারণ আমি এলিনের সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করলেও সরল প্রাণা এলিনা আমাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে---

বনহুর নিজের অজ্ঞাতেই যেন আনমনা হয়ে যায়, কিছু যেন ভাবে সে মনোযোগ সহকারে। তারপর বলে আবার— এলিন এখন নিঃসহায়, আত্মীয়হীন—ওকে কি করা যায় বলো?

রহমান জবাব দিলো—ওকে ওর দেশে পাঠিয়ে দিলে হয় না?

বনহুর বিছানায় উঠে বসলো, বালিশটা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে ভাল হয়ে বসে বললো—রহমান, তুমি জানো না সে কতখানি অসহায়! তাকে দূর কোনো দেশ থেকে চুরি করে আনা হয়েছিলো। এত ছোট বেলায় তাকে চুরি করে আনা হয়েছিলো যখন তার কোনোরকম জ্ঞান হয়নি। সে জানতো না তার নাম কি, জানতো না কি তার পরিচয়--

বনহুরের কথা শেষ হয় না, কক্ষে প্রবেশ করেন হোটেলের ম্যানেজার কিউস্মিথ, তার সঙ্গে পুলিশ ইন্সপেক্টারও আরও দু'জন পুলিশ অফিসার হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

বনহুর আর রহমান উঠে তাদের অভ্যর্থনা জানালো।

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তাদের মুখের দিকে।

ম্যানেজার কিউস্মিথ ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলেন—মিঃ সোহেল, একটা আশ্চর্য সংবাদ!

বলুন? বললো বনহুর।

ম্যানেজার কিউস্মিথ বলার পূর্বেই বলে উঠলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার—মিঃ হাউবার্ডের মৃতদেহ মর্গ থেকে উধাও হয়েছে মিঃ সোহেল।

অকস্মাৎ কক্ষমধ্যে বাজ পড়লো যেন।

মুহূর্তে বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন এবং চিন্তাযুক্ত হয়ে উঠলো, ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। অস্ফুট গম্ভীর কণ্ঠে বললো—মিঃ হাউবার্ডের লাশ মর্গ থেকে উধাও হয়েছে—বলেন কি?

হাঁ মিঃ সোহেল, ভোরে সুইপার মর্গে গিয়ে দেখতে পায় ট্রেচার শূন্য পড়ে আছে, হাউবার্ডের লাশ নেই। কথা কয়টা বলে থামলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার।

বনহুর সবাইকে বসার জন্য অনুরোধ জানালো।

আসন গ্রহণ করলেন সবাই।

বনহুর একবার রহমানের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। দেখলো রহমানের মুখমন্ডল কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। বনহুর তাকে লক্ষ্য করে বললো—মিস্ এলিনকে ডেকে আনো রহমান।

রহমান নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো এলিনকে সঙ্গে নিয়ে।

বনহুর এলিনকে বললো—বসো।

এলিন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে অবাক চোখে তাকাচ্ছিলো কক্ষস্থ সকলের মুখের দিকে। মিঃ সোহেলের কক্ষে অসময়ে এদের দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে এলিন।

বনহুর বললো—এলিন, তোমার বাবার লাশ মর্গ থেকে উধাও হয়েছে!

বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ালো এলিন, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—মর্গ থেকে লাশ উধাও হয়েছে?

হাঁ এলিন।

এলিনের চোখ দুটো যেন গোলাকার হয়ে উঠেছে। ভয়ে দেহটা ওর বেতস্‌পত্রের মত থরথর করে কাঁপছে। পড়ে যাচ্ছিলো এলিন, বনহুর ওকে ধরে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। তারপর নিজের শয্যায় শুইয়ে দিলো।

অল্পক্ষণেই কক্ষমধ্যে ভীড় জমে গেলো। সকলের চোখে মুখেই একটা ভীতিভাব। ম্যানেজার বললেন—আপনারা দয়া করে, কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। এখানে ভীড় করবেন না।

কয়েকজন এলিনের সংজ্ঞা ফিরে আনার চেষ্টা করতে লাগলো। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগলো, বাবার মৃত্যুতে যে যুবতী জ্ঞান হারালো না,

সেই যুবতী কি করে আর কেনই বা অজ্ঞান হলো বাবার মৃতদেহের উধাও সংবাদ পেয়ে।

ডাক্তার এলেন। এলিনকে পরীক্ষা করে বললেন—অত্যন্ত বিচলিত এবং ঘাবড়ে যাওয়ার জন্য এমন হয়েছে। বিশ্রাম ও নিরিবিলির প্রয়োজন।

পরদিন।

এলিন শয্যায় শায়িত।

বনহুর পাশে বসে আছে। এলিন ওর হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে আছে চোখেমুখে ওর ভীত আর আতঙ্কভাব। বনহুরকে সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় নিজের পাশে। মনোভাব বনহুর সরে গেলেই যেন ওর বিপদ ঘটবে।

বনহুর সান্ত্বনার স্বরে বললো—এলিন, ভয় নেই, হাউবার্ডকে যে বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছিলো তা অতি মারাত্মক। কাজেই সে কিছুতেই জীবিত হতে পারে না---

না না, আমার মন বলছে ঐ কাপালিক নররক্ত পিপাসু মরেনি। সে বেঁচে আছে ---সে বেঁচে আছে। আমাকে সে হত্যা না করে ছাড়বে না মিঃ সোহেল। এলিনের সমস্ত মুখে তখন একটা দারুণ উদ্বিগ্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো।

বনহুর এলিনকে যতই সান্ত্বনা দিক, আসলে তার মনেও ভীষণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। কারণ পুলিশ মর্গ থেকে লাশ উধাও হওয়া কম কথা নয়। বনহুর এলিনের জন্য বেশি চিন্তিত, কারণ হাউবার্ড যদি সত্যিই জীবন ফিরে পেয়ে উধাও হয়ে থাকে তাহলে এলিনকে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। এলিনের প্রতি তাই বনহুর নজর রাখলো নিপুণভাবে।

❑

একসময় রহমান বললো—সর্দার, কান্দাই ফিরে যাওয়া একান্ত দরকার। কারণ কান্দাই অধিবাসিগণের মধ্যে আবার ভীষণ একটা অরাজকতা দেখা দিয়েছে। শুধু নাগরিকের মধ্যেই নয়, কান্দাই মহারাজ হিরোন্ময় সেন প্রজাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার-অনাচার শুরু করে দিয়েছে।

আমি জানি রহমান, আর সেই কারণেই আমি তোমাদের বৌরাণীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে নাগরিক জীবন-যাপন করবো বলে মনস্থ করেছিলাম

নগরমধ্যে বাস করে আমি নগরের ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু--

বনহুরের কথা শেষ হয় না, দমকা হাওয়ার মত তাদের ক্যাবিনে প্রবেশ করে এলিন, চোখেমুখে দারুণ ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ছুটে এসে জাপটে ধরে বনহুরকে—আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান মিঃ সোহেল---

বনহুর আর রহমান আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো, হঠাৎ এলিন তার কামরা থেকে এভাবে ঝড়ের বেগে ছুটে আসবে তাদের ক্যাবিনে, ভাবতেও পারেননি তারা।

রাত এখন বেশি নয়, সাড়ে বারোটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

বনহুরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে এলিন, বনহুর যেন হকচকিয়ে গেলো। বিশেষ করে রহমান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, সেকারণেই বনহুর বিব্রত বোধ করলো বেশি।

এলিন থরথর করে কাঁপছে আর বলছে—আমাকে বাঁচান মিঃ সোহেল! আমাকে বাঁচান! বাঁচান----

বনহুর বললো—কি হয়েছে বলো? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এলিন?

ভয়ঙ্কর দু'খানা হাত---ভয়ঙ্কর দু'খানা হাত মিঃ সোহেল। আমাকে গলা টপে হত্যা ---করতে --এ --সে--ছি--লো--ভয়ঙ্কর--দুটি --হাত--

বনহুর এলিনকে সাহস দিয়ে বললো—কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছো এলিন!

না, আমি দুঃস্বপ্ন দেখিনি মিঃ সোহেল। আমি তখনও নিদ্রা যাইনি, ঠিক সেই সময় অন্ধকারে দু'টি হাত আমার গলার দিকে এগিয়ে আসছিলো। আমি স্পষ্ট দেখিছি দু'টি হাত—সেকি ভয়ঙ্কর জমকালো দু'টি হাত মিঃ সোহেল! না না, আমি স্বপ্ন দেখেনি---বনহুরের জামার আস্তিন এঁটে ধরে কথাগুলো বলে চলেছে এলিন।

রহমান কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে এলিন আর সর্দারের দিকে। সেও কম বিস্মিত হয়নি, এলিন যে কোনো মিথ্যা কথা বলছে না বা স্বপ্ন নয় তা ওর মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে।

অনেক বুঝানো সত্ত্বেও এলিন তার ঘরে ফিরে আর গেলো না। সে বনহুরের ক্যাবিনেই থাকবে জেদ ধরে বসলো।

রাত বেড়ে আসছে।

রহমান বারবার হাই তুলছিলো, কারণ তার খুব ঘুম পাচ্ছিলো, বললো রহমান—সর্দার, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

বেশ, তুমি যাও শোওগে।

রহমান বেরিয়ে যায়।

বনহুর তাকায় এলিনের দিকে, ভয়-বিহ্বল চোখে এলিন তাকিয়ে আছে। বনহুর হাতঘড়ির দিকে দেখে নেয় রাত একটা বেজে গেছে প্রায়। বললো এবার সে—এলিন, এবার তাহলে শুয়ে পড়ো।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো বনহুর এলিনের পাশে। এলিন অসহায় করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। বনহুর বিছানার দিকে আংগুল দেখিয়ে আবার বললো—যাও বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।

এলিন বললো—আর আপনি?

বনহুর সোফায় ধপ্ করে বসে পড়ে দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললো—আমার এখানেই চলবে।

এলিন অগত্যা শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

বনহুর সোফায় হাতলে মাথায় ঠেশ দিয়ে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

এলিন অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিলো, অল্পক্ষণেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লো সে।

দেয়াল ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করে বেজে চলেছে।

ক্যাবিনের দরজা-জানালা সব বন্ধ, রহমান বেরিয়ে যাবার পূর্বে চারিদিকের জানালাগুলো ভালভাবে বন্ধ করে যেতে ভুলেনি। কারণ এলিনের কথাগুলো তাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলো। শুধু এলিনের জন্য নয়, সর্দারের জন্য সে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো তাই ক্যাবিনের জানালাগুলো খুব ভালভাবে বন্ধ করে তবেই রহমান নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

বনহুর কিন্তু ঘুমাতে পারেনি কিছুতেই। চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ পড়ে রইলো নিস্তব্ধ হয়ে।

এলিনের নিশ্বাসের শব্দ আর ঘড়ির কাঁটার টিক্‌টিক্ শব্দ মিলে নির্জন ক্যাবিনটাকে কেমন যেন ভারগম্ভীর করে তুলেছিলো। এপাশ-ওপাশ করছে বনহুর।

অনেক চেষ্টা করেও বনহুর ঘুমাতে পারছে না, এলিনের উক্তিগুলোই সে ভেবে চলেছে। মিঃ হাউবার্ডের মৃতদেহ উধাও ব্যাপারের সঙ্গে তবে কি এলিনের সেই ভয়ঙ্কর হাত দু'খানার কোনো যোগাযোগ আছে? এলিন কি

সত্যিই এমনি কোনো হাত দেখেছিলো? যে হাত দু'খানা তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলো? বনহুর যেন কিছুতেই এলিনের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলো না, কারণ এলিন যা বলেছিলো সে কথাগুলো বড় অদ্ভুত আর আজগুবি ধরনের ছিলো।

রাত অনেক বেজে গেছে।

বনহুর ঘুমাতে পারেনি এখনও। ডিমলাইটের স্বল্পালোকে নিজের বিছানার দিকে তাকালো। শুভ্র শয্যায় এক থোকা রজনী গন্ধার মত পড়ে আছে এলিন।

বনহুর সহসা দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারলো না। ধীরে ধীরে ওর মন থেকে সব চিন্তা সরে গেলো, তার মনে জেগে উঠলো পৌরুষ মনোভাব।

বনহুর একসময় নিজের অজ্ঞাতে এসে দাঁড়ালো এলিনের শয্যার পাশে। নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে রইলো এলিনের নিদ্রামগ্ন মুখমন্ডলের দিকে।

কক্ষের স্বল্প আলোতে এলিনকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

বনহুর নিজকে সংযত রাখতে পারছে না যেন কিছুতেই, সে পায়চারী করতে লাগলো এবার। মাঝে মাঝে ওর দৃষ্টি চলে যাচ্ছিলো এলিনের এলায়িত সুকোমল দেহখানির দিকে।

একসময় পায়চারী বন্ধ করে এলিনের শয্যার পাশে এসে বসে বনহুর। দক্ষিণ হস্তখানা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ওর এলিনের গন্ডের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কোনো একটা শব্দে চমকে উঠে বনহুর। উঠে দাঁড়ায় এলিনের শয্যা থেকে, ফিরে আসে নিজের আসনে।

আবার এলিয়ে দেয় দেহখানা সোফায়।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়—ফিরে তাকায় সে এলিনের শয্যার দিকে। বিদ্যুৎগতিতে সোজা হয়ে বসে বনহুর—এলিন শয্যায় নেই, শয্যা শূন্য!

ছুটে যায় বনহুর এলিনের শূন্য বিছানার পাশে, ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে কক্ষমধ্যে চারিদিকে তাকায়। কক্ষমধ্যে কোথাও এলিন নেই, সমস্ত কক্ষ নির্জন নিস্তব্ধ। বনহুরের চোখদুটো অকস্মাৎ চলে যায় ওদিকে জানালার দিকে। বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে যায় বনহুর—জানালা ভাঙ্গা, জানালার মোটা শিকগুলো একেবারে বাঁকিয়ে ফেলা হয়েছে--

বনহুর ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটে যায় জানালার কাছে। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সে ভাঙ্গা জানালার দিকে, ঐ পথে কেউ এলিনকে নিয়ে উধাও হয়েছে তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। ব্যথায় বনহুরের মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো। নিজে নিদ্রা যাওয়ার জন্য অনুতাপে ভরে উঠলো তার মন। সোফায় বসে চুলগুলো টানতে লাগলো বনহুর নিজের মাথার।

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুর—রাত এখন চারটা বেজেছে। হোটেল নীরব নিস্পন্দ, একটি শব্দও কোথাও শোনা যাচ্ছে না। রহমান বা ম্যানেজারকে জানাবে কিনা ভাবতে লাগলো। জানিয়ে কোনো ফল হবে না, বনহুর রিভলভার হস্তে বেরিয়ে পড়লো ক্যাবিন থেকে।

অন্ধকার রাত। নিস্তব্ধ হোটেলের বারান্দা বেয়ে বনহুর এগিয়ে চললো সামনের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে কিন্তু কোথাও কোনো কিছু নজরে পড়লো না।

বনহুর গভীর রাতে হোটেলের চারিপাশে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করলো কোথাও কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা। হঠাৎ বনহুরের নজরে পড়লো, হোটেলের সম্মুখে রাস্তার উপরে সাদা কিছু পড়ে আছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো বনহুর সাদা জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে বুঝতে পারলো সেটা এলিনের স্কার্ফ।

বনহুর স্কার্ফটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার উপর। এলিনকে এ পথ ধরেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রায় ঘন্টা দুই কেটে গেছে বনহুরের হোটেলের চারপাশ খোঁজ করতে গিয়ে। বনহুর এবার স্কার্ফখানা হাতে নিয়ে যখন ফিরে এলো তখন ভোরের আলোয় ভরে উঠেছে চারিদিক।

বনহুর হোটেলে নিজ ক্যাবিনে এসে দাঁড়াতেই রহমান ব্যস্ত হয়ে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, বনহুরকে দেখে তার চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো—সর্দার, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

বনহুর রহমানের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে হাতের রিভলভারটা বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ে। সমস্ত মুখমন্ডলে তার ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

রহমান সর্দারের মুখোভাব লক্ষ্য করে চিন্তিত হলো, না জানি কি একটা কিছু ঘটেছে, যার জন্য সর্দার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

রহমান নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সর্দারের মুখের দিকে। আর কোনো প্রশ্ন করার মত সাহস হচ্ছে না তার।

বনহুর সোফায় ঠেশ দিয়ে হতাশ কণ্ঠে বললো—রহমান, এলিনকে রক্ষা করতে পারিনি।

রহমান এতক্ষণ এলিন সম্বন্ধে খেয়ালই করেনি—সে ভেবেছিলো, এলিন হয়তো তার ঘরে চলে গেছে। সর্দারের জন্যই রহমান ভাবিত হয়ে পড়েছিলো। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো রহমান—এলিন কোথায় সর্দার?

বনহুর ক্যাবিনের জানালার দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

রহমান সেই দিকে নজর দিয়েই ভূত দেখার মতই চমকে উঠলো, ঢোক গিলে বললো—জানালা ভাঙ্গা, কি অদ্ভুত কান্ড—এত মোটা মোটা শিকগুলো বাঁকানো হয়েছে।

হাঁ, ঐ পথে এলিনকে হাউবার্ড নিয়ে উধাও হয়েছে রহমান।

রহমান বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—হাউবার্ড।

হাঁ রহমান, হাউবার্ড জীবিত আছে।

কি সর্বনাশ, এলিনকে তাহলে হাউবার্ডই চুরি করে নিয়ে গেছে?

সে ছাড়া এমন আক্রোশ এলিনের উপর কারো ছিলো না। একটু থেমে পুনরায় বললো বনহুর—বেচারী বাঁচতে চেয়েছিলো কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।

রহমান সর্দারের ব্যথাকরুণ কণ্ঠস্বরে নিজেও যারপরনাই ব্যথিত হলো।

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো নিজকে সংযত করে নেওয়ার জন্য।

❑

গভীর জঙ্গলমধ্যে একটা সুড়ঙ্গপথ।

এলিনের দেহটা কাঁধে নিয়ে ভীষণ চেহারার একটা লোক এগিয়ে চলেছে সুড়ঙ্গপথ ধরে।

ভীষণ চেহারার লোকটা অন্য কেউ নয়—স্বয়ং হাউবার্ড। আজ তার দেহে কোনো বর্ম নেই, শুধু দেহটা ফুলে মোটা হয়ে উঠেছে তার স্বাভাবিক দেহের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। জমাট কালো তার দেহটা কঠিন লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কেউ দেখলে তাকে হাউবার্ড বলে চিনতে পারবে না।

হাউবার্ডের শরীর এমন বিষাক্ত ওষুধ দ্বারা পাকানো হয়েছিলো যার জন্য বনহুরের দেওয়া বিষাক্ত ঔষধের ইনজেকশন কার্যকরী হয়নি। তাকে মৃত বলে সনাক্ত করা হলেও আসলে তার মৃত্যু ঘটেনি। ডাক্তারী পরীক্ষার পর তাকে পুলিশমর্গে রাখা হয়েছিলো। তাকে সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত করে একটা ট্রেচারে শুইয়ে রেখেছিলো, কারণ তখনও হাউবার্ডকে দেখার জন্য মরিলার মহারাজ আসেননি। মহারাজ আসবেন পরদিন, কিন্তু রাতেই হাউবার্ডের মৃতদেহ উধাও হয়েছিলো অদ্ভুতভাবে।

এলিনের দেহটা নিয়ে হাউবার্ড সুড়ঙ্গপথে ফিরে এলো মরিলা জঙ্গলের তলায় গোপন এক গুহায়।

এলিনকে শুইয়ে দিলো হাউবার্ড পাথরের মেঝেতে।

তারপর হাতে তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভয়ঙ্কর চেহারার লোক কোথা থেকে এসে দাঁড়ালো হাউবার্ডের সম্মুখে। তাদের হাতে এক-একটা সূতীক্ষ্ণ ধার বর্শা।

হাউবার্ড বললো—এলিনকে নিয়ে এসেছি। বিশ্বাসঘাতিনীকে হত্যা করে রক্ত পান করবো।

একসঙ্গে লোকগুলো বর্শা উদ্যত করে এলিনকে হত্যা করতে গেলো।

হাউবার্ড বিশাল হাতখানা উঁচু করে বললো—না, ওভাবে নয়। খর্গ দিয়ে ওর মাথাটা কেটে আমি রক্ত চুষে খাবো। বিশ্বাসঘাতিনীই আমাকে সেদিন বিষাক্ত ইনজেকশন দ্বারা হত্যা করেছিলো।

একজন বললো—আমাকে আদেশ করুন কাপালিক বাবা, আমিই ওকে হত্যা করে মাথাটা আপনার হাতে তুলে দেই।

আজ নয়।

আজ নয় কেন কাপালিক বাবা?

আজ আমি রক্ত খাবো না মার্লেশ সিং। রক্তের নেশা আমাকে পাগল করলেও আমি নিজকে শক্ত করে নিয়েছি। কারণ আমি লোকসমাজে জানাতে চাই কাপালিকের সত্যি মৃত্যু ঘটেছে।

আসন গ্রহণ করলো হাউবার্ড, বললো আবার সে—মার্লেশ সিং তুমি এই শয়তানী এলিনকে লৌহশিকলে আবদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখো। ওকে শাস্তি দিয়ে তিল তিল করে মারবো।

তৎক্ষণাৎ এলিনের সংজ্ঞাহীন দেহটা লৌহশিকলে আবদ্ধ করে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। তারপর চললো নানারকম অত্যাচার। হাউবার্ডের আদেশে চাবুক মারা হতে লাগলো এলিনের শরীরে।

হাউবার্ড তখন গুহার মধ্যে একটা বিরাটকায় আসনে বসে কিছু তরল পদার্থ পান করছিলো।

হাউবার্ডের চারপাশ ঘিরে বসলো তার দলবল, তারাও নেশাপানে মত্ত হয়ে উঠলো।

সম্মুখে একটা লৌহথামের সঙ্গে ঝুলছে এলিনের দেহটা। চাবুকের আঘাতে দেহের বসন ছিড়ে গেছে খন্ড খন্ড হয়ে।

একজন বললো—মালিক ওকে এভাবে মেরে কোনো ফল হবে না। এখন ও অজ্ঞান আছে, কিছুই অনুভব করতে পারছে না।

আর একজন বললো—ঠিক্ বলেছিস্ চার্লিং সিং, ওর জ্ঞান নেই, ওকে মেরে কিছু হবে না। জ্ঞান ফিরে এলে যত খুশি মারতে হবে, চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হবে ওর দেহ থেকে।

এবার হাউবার্ড বলে উঠলো—বিশ্বাসঘাতিনী ঐ নেংটি ইঁদুরটার সঙ্গে মিশে আমাকে বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করে হত্যা করেছিলো। ওকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না, হত্যাও করবো না সহজে।

তাহলে কি করবেন মালিক? বললো মার্লেশ সিং।

হাউবার্ড বড় একটা বাটিভর্তি মদ মুখে ঢেলে দিয়ে বললো— হত্যা করলে তো মরেই গেলো। ওকে জীবিত রেখে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। দাও, আমার দেহে ১নং শিশি দিয়ে দাও।

হাউবার্ড লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো আসনের উপরে।

একটা লোক মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাব্স্ পরা সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে এলো, হাউবার্ডের দেহে ঔষধটা পুশ্ করে দিলো সে। তবে হাতে পায়ে নয়, বাম কাঁদের বাম পাশের কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে।

অল্পক্ষণেই হাউবার্ডের দু'চোখ মুঁদে এলো, নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো শয়তান কাপালিক হাউবার্ড।

যখন ওর নিদ্রাভংগ হলো তখন তার দেহ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এখন তাকে মরিলা হোটেলের মালিক হাউবার্ড বলে চিনতে ভুল হবে না কারো।

হাউবার্ড জেগেই হুঙ্কার ছাড়লো—কোলাইম্যান, সিংহিলাউ, মার্লেশ সিং--

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে ছুটে এলো সবাই, ঘিরে দাঁড়ালো হাউবার্ডের চারপাশে।

হাউবার্ড চিৎকার করে বললো—জ্বালা, বুকের জ্বালা, বড্ড জ্বালা। রক্ত,---রক্ত দাও মার্লেশ সিং--

রক্ত কোথায় পাবো মালিক, আপনি না বলেছেন মরিলা দ্বীপে কোনো নরহত্যা করা চলবে না।

সে কয়েক সপ্তাহের জন্য মাত্র। এলিনের জন্যই আমি বাধ্য হয়ে নরহত্যা বন্ধ করেছি। ওকে যেদিন হত্যা করবো সেদিন হতে আবার আমি হবো কাপালিক হাউবার্ড--এখন বুকটা আমার বড্ড জ্বালা করছে। যা থাকে তাই নিয়ে এসো। তাই নিয়ে এসো মার্লেশ সিং।

শরাব আনবো মালিক?

হাঁ, নিয়ে এসো। শরাব নিয়ে এসো কোলাইম্যান। সিংহিলাউ, মার্লেশ সিং, তোমরা এলিনকে ঝুলিয়ে রেখেছো তো?

হাঁ, মালিক।

তাকে চাবুক মারা হচ্ছে তো?

হাঁ মালিক, তাকে চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে।

যাও, আরো লাগাও। চামড়া ছাড়িয়ে ফেলোগে।

মালিক, এলিনের জ্ঞান ফিরে এসেছে, তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বটে কিন্তু সে চিৎকার করে কাঁদাকাটা করে চলেছে।

কোনো কিছুই তোমরা শুনবে না। আমাকে সে হত্যা করে ছিলো, আমাকে সে বিষাক্ত ঔষধ দিয়ে হত্যা করেছিলো। বিশ্বাসঘাতিনী শয়তানীকে আমি নিজ কন্যার মত করেই মানুষ করেছিলাম। তারই প্রতিদানে সে আমাকে ..... চলো, আমি নিজে গিয়ে ওকে দেখবো।

হাউবার্ড উঠে দাঁড়ালো।

কোলাইম্যান আর মার্লেশ সিং তাকে ধরে নিয়ে চললো। হাউবার্ডের দেহটা টলছে এখনও মাতালের মত।

যে স্থানে এলিনকে লৌহশিকলে আবদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো সেস্থানে এসে দাঁড়ালো হাউবার্ড। তীব্র কটাক্ষে তাকালো সে এলিনের রক্তাক্ত ছিন্নবসন দেহখানার দিকে। চুলগুলো এলিনের এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার কাঁধের চারপাশে। জামা ছিঁড়ে কাঁধ বেরিয়ে পড়েছে। পিঠের যে অংশ দেখা যাচ্ছিলো সে অংশ রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

হাউবার্ড এলিনের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠলো। সে কি বিকট আর বীভৎস হাসি, তার হাসির শব্দে কেঁপে উঠলো সুড়ঙ্গমধ্যস্থ গুহাপথ।

এলিন জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা চেটে নিয়ে ভয় বিহ্বল করুণ দৃষ্টি মেলে তাকালো হাডবার্ডের পৈশাচিক মুখ মন্ডলের দিকে।

হাউবার্ড দাঁতে দাঁত পিষে বললো—লাগাও চাবুক। আরও লাগাও। চামড়া তুলে নাও কোলাইম্যান, ওর চামড়া ছাড়িয়ে নাও। শয়তানী বিশ্বাসঘাতিনী, আমার সঙ্গে চাতুরী! আমাকে হত্যা করেছিলি কোন্ সাহসে? বুঝেছি সব, ঐ মিঃ সোহেলের চক্রান্তে আমাকে তুই হত্যা করেছিলি। সব জানি, সব জানি আমি---

এলিন বহুকষ্টে উচ্চারণ করলো—একটু জল দাও--একটু জল দাও--

জল খাবে? হাউবার্ড কোলাইম্যানকে ইশারা করলো পানির পেয়ালাটা ওর মুখের সম্মুখে বাড়িয়ে ধরতে।

কোলাই মালিকের ইঙ্গিতে পানির পেয়ালা এলিনের মুখের কাছে এগিয়ে ধরলো।

এলিনের দু'হাত দু'পাশে লৌহশিকল দিয়ে বাঁধা ছিলো। কোলাইম্যানের হাতে পানির পেয়ালা দেখে মাথাটা এগিয়ে দিলো সেইদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে হাউবার্ড পিশাচের মত বললো—পেয়ালা সরিয়ে নাও কোলাইম্যান, ওকে জল দিও না।

আদেশ পালন করলো কোলাইম্যান।

এলিনের মুখের কাছ থেকে পানির পাত্র সরিয়ে নিলো সে।

হাউবার্ড হেসে উঠলো আবার হাঃ হাঃ করে।

এলিন মৃত্যুমলিন অসহায় চোখে তাকালো হাউবার্ডের কঠিন মুখখানার দিকে।

হাউবার্ডকে নর শয়তান বলেই মনে হচ্ছিলো তখন।

অসহায় এলিনের উপর চলেছে হাউবার্ডের নির্মম অকথ্য নির্যাতন। আজ দু'দিন তাকে এমনিভাবে লৌহশিকলে আবদ্ধ করে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি তাকে। চোখ বসে গেছে, চেহারা বিবর্ণ হয়েছে—আর কতক্ষণ এমনি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করবে সে।

এখানে যখন হাউবার্ডের গোপন সুড়ঙ্গমধ্যে এলিনের উপর অত্যাচার চলেছে তখন মরিলা দ্বীপে আবার ভীষণ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এলিনের অন্তর্ধান নিয়ে।

পুলিশমহল এলিনের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দ্বীপের সর্বত্র পুলিশ নানাভাবে খোঁজ খবর চালাচ্ছে কিন্তু এলিনের আজও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

❑

এলিনের দেহটা নেতিয়ে পড়েছে, এবার তার মৃত্যু নিশ্চিত। আজ পুরো তিন দিন তাকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। এক ফোঁটা পানি তার মুখে পড়েনি। চলেছে তার উপরে নির্মম অত্যাচার। মাঝে মাঝে তার সম্মুখে পানির পাত্র ধরা হচ্ছে, আবার সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সে পাত্র স্পর্শ করার পূর্বেই।

হাতে -পায়ে শিকল কেটে বসে গেছে একেবারে।

জামা ছিড়ে খসে পড়েছে দেহ থেকে, প্যান্টেরও স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গেছে। সে কি নির্মম করুণ দৃশ্য।

অন্ধকার সুড়ঙ্গমধ্যে গুপ্তগুহা।

এলিনকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একটা লৌহথামের সঙ্গে। গুহার মধ্যে দু'পাশে দুটো মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে এলিনকে জীবন্ত প্রেতাত্মার মত মনে হচ্ছে।

হাউবার্ড আর তার অনুচরগণ প্রবেশ করলো সে গুহামধ্যে। আজ এলিনকে হত্যা করবে হাউবার্ড এবং সেই কারণেই এখন তারা আগমন করেছে। এক-একজনকে ভয়ঙ্কর নর পিশাচের মত লাগছে। হাউবার্ডের হাতে সূতীক্ষ্ণ ধার খর্গ।

এলিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো হাউবার্ড, কোলাইম্যান, সিংহিলাউ, মার্লেশ লিং। প্রত্যেকেই যেন এক একটা যমদূত।

এলিন ওদের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—হাউবার্ড আমাকে হত্যা করো, আমাকে হত্যা করো হাউবার্ড, আমি এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।

এলিনের কথায় হাউবার্ড ও তার দলবল হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো হাউবার্ড—এলিন, আজ তুমি মুক্তি পাবে--

এলিনের মৃত্যুমলিন নিষ্প্রভ চোখ দুটো চকচক করে উঠলো, বললো—আমাকে মুক্তি দেবে তোমরা? আমাকে মুক্তি দেবে?

হাঁ, আমি মুক্তি দেবো—কিন্তু জীবন দান নয়, জীবন নাশ করে।

শিউরে উঠলো এলিন। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা বারবার চাটতে লাগলো অসহায়ভাবে।

হাউবার্ডের হাতের খর্গখানা মশালের আলোতে চক্‌চক্ করে উঠলো। কঠিন কণ্ঠে দাঁত পিষে বললো—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও এলিন! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি গ্রহণ করো!

হাউবার্ড খর্গ উদ্যত করে এলিনের মস্তক দ্বিখন্ডিত করতে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে পিছনে বজ্রকঠিন কণ্ঠে কে যেন গর্জে উঠলো—ক্ষান্ত হও হাউবার্ড!

শূণ্যে খর্গখানা থেমে গেলো হাউবার্ডের হস্তে, ফিরে তাকালো সে। হাউবার্ডের সঙ্গে কোলাইম্যান, সিংহিলাউ, মার্লেশ সিং বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে তাকালো। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে ওরা দেখলো তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি জমকালো মূর্তি। তার দু'হাতে দুটি রিভলভার। মুখের অর্ধেক অংশ পাগড়ীর আঁচলে ঢাকা। চোখ দুটিতেও কালো চশমা রয়েছে।

হাউবার্ড জমকালো মূর্তি লক্ষ্য করে ভড়কে গেলো না, সে ঘাবড়ে গেলো তার হাতের আগ্নেয় অস্ত্র দুটি লক্ষ্য করে। এক্ষণে হাউবার্ডের দেহে কোনো বর্ম পরা ছিলো না,বিশেষ করে সেই কারণেই সে বেশি ভীত হলো। এই মুহূর্তে তার দেহে যদি বর্ম পরা থাকতো তাহলে কোনো অস্ত্রকেই হাউবার্ড কেয়ার করতো না।

এবার হাউবার্ড কঠিন কণ্ঠে বললো—কে তুমি? আর কেমন করেই বা আমার এই গোপন সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলে?

হাউবার্ডের কথার ফাঁকে কোলাইম্যান, সিংহিলাউ, আর মার্লেশ সিং সরে পড়তে যাচ্ছিলো। হয়তো অস্ত্র নিয়ে জমকালো মূর্তিকে আক্রমণ করবে, এই অভিসন্ধি নিয়েই মতলব আঁটছিলো ওরা।

জমকালো মূর্তি হুঙ্কার ছাড়লো—এক পা নড়েছো কি মরেছো।

বাধ্য হয়েই থেমে পড়লো ওরা তিন জন।

হাউবার্ডের শয়তানিভরা কঠিন মুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। খর্গসহ হাতখানা ধীরে ধীরে নেমে এলো নিচের দিকে বললো আবার —জবাব দাও কে তুমি?

আমি তোমাদের যমদূত।

যমদূত? অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো হাউবার্ড।

তার অনুচরগণের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হলো।

হাউবার্ড খর্গ উত্তোলন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো জমকালো মূর্তির উপর—যমদূত তোমাকে আমি হত্যা করবো।

সঙ্গে সঙ্গে জমকালো মূর্তি হাউবার্ডের উদ্যত হস্ত লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো।

মুহূর্তমধ্যে হাউবার্ডের দক্ষিণ হস্ত থেকে খর্গ খসে পড়লো, ঝুলে পড়লো ওর হাতখানা। রক্তের ধারা ছুটলো তীরবেগে।

মালিকের হাত থেকে খর্গ ভুলুণ্ঠিত হতেই মার্লেশ সিং দ্রুত হস্তে খর্গখানা তুলে নিতে গেলো।

জমকালো মূর্তি সে সুযোগ দিলো না ওকে, তার হস্তের রিভলভার গর্জে উঠলো।

তৎক্ষণাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মার্লেশ সিং, একটা তীব্র আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়লো নিস্তব্ধ সুড়ঙ্গ গুহায়।

এলিন মৃত্যুকাতর যন্ত্রণায় যদিও ছটফট করছিলো, সেও আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। জমকালো মূর্তির কার্যকলাপ তাকেও বিস্ময়াহত করে তুলেছিলো। কে এই যমদূত যে অকস্মাৎ যাদুমন্ত্রের মত আবির্ভূত হলো এই গোপন সুড়ঙ্গ মধ্যে। কাতর দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলো তার জীবনরক্ষকের দিকে।

মার্লেশ সিং-এর দেহটা বার দুই মোচড় খেয়ে অসাড় হয়ে পড়লো। চিরদিনের জন্য বিদায় হলো সে।

মার্লেশ সিং-এর ভয়াবহ মৃত্যু হাউবার্ড এবং তার সঙ্গী দু'জনকে আতঙ্কিত করে তুললো। মার্লেশ সিং-এর পাঁজর ভেদ করে চলে গেছে জমকালো মূর্তির রিভলভারের গুলী। রক্তে লালে লাল হয়ে উঠলো পাথুরে মেঝেটা।

হাউবার্ড তার হাতের যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেলেছে। হাত দিয়ে রক্তের ধারা বইছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে হাউবার্ড, বোধ হয় পালাবার পথ খুঁজছে সে।

সঙ্গীর অবস্থা দেখে কোলাইম্যান আর সিংহিলাউ দারুণভাবে ছটফট করতে লাগলো। আর কেউ সাহসী হচ্ছে না এক পা নড়তে। ওরা ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে বারবার জমকালো মূর্তিটার দিকে।

জমকালো মূর্তি এবার সিংহিলাউ-এর বুক লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো।

মুহূর্তে তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সিংহিলাউ। একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করে স্তব্ধ হয়ে গেলো ওর কণ্ঠ চিরদিনের জন্য।

জমকালো মূর্তি আর বিলম্ব করলো না, এবার সে হাউবার্ডের বুক লক্ষ্য করে দক্ষিণহস্তের রিভলভার তাক করলো। হাউবার্ড ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো—তুমি কি চাও বলো, আমি তাই দেবো। তবু আমাকে হত্যা করো না।

জমকালো মূর্তি দাঁতে দাঁত পিষে বললো —এলিনকে মুক্ত করে দাও।

হাউবার্ড বামহস্তে চাবি নিয়ে এলিনের লৌহশিকলের তালা খুলতে গেলো কিন্তু একহস্তে তালা খোলা সম্ভব হলো না।

জমকালো মূর্তি গর্জে উঠলো—চাবির গোছা ওকে দাও। আংগুল দিয়ে কোলাইম্যানকে দেখিয়ে দিলো সে।

হাউবার্ড চাবির গোছা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

কোলাইম্যান ভয়াতুর চোখে জমকালো মূর্তির দিকে এক নজর তাকিয়ে মালিকের বাম হাত থেকে চাবির গোছা নিলো তারপর খুলে দিলো বাধ্য দাসের মত ধীরে ধীরে।

কোলাইম্যান চাবির গোছা নিয়ে এলিনের লৌহশিকলের তালা খুলে দিতেই এলিন খপ করে পড়ে গেলো মেঝেতে কারণ তার দাঁড়াবার শক্তিটুকুও ছিলো না।

জমকালো মূর্তির রিভলভার গর্জে উঠলো তৃতীয়বারের মত। কোলাইম্যান মোচড় খেয়ে পড়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আর্তনাদ করে উঠলো।

এবার জমকালো মূর্তি বললো—হাউবার্ড পুলিশ মর্গ থেকে তুমি পালিয়েছিলে! মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করেছিলে তোমার বিষাক্ত ওষুধ হজম করার অসীম শক্তিবলে। কিন্তু এবার তোমাকে রেহাই দেবো না। এবার তুমি মর্গ থেকে সরে পড়ার ক্ষমতাচ্যুত হবে।

হাউবার্ড ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে দেখে নিলো কোলাইম্যানকে কোলাইম্যান তখন মেঝেতে পড়ে বলি পাঁঠার মত ছটফট করছিলো।

জমকালো মূর্তি ওকে এগুতে দিলো না, গুলী ছুঁড়লো সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, অকস্মাৎ হাউবার্ড কোথায় অন্তর্ধান হলো চোখের নিমিশে!

এলিনকে ছেড়ে সরে এলো জমকালো মূর্তি যে স্থানে হাউবার্ড একটু পূর্বে দাঁড়িয়েছিলো সেই স্থানে। অনেক সন্ধান করেও জমকালো মূর্তির

হাউবার্ডের কোনোই খোঁজ পেলো না। কি আশ্চর্য কোনোরকম কিছুই নজরে পড়লো না কোন পথ সে অন্তর্ধান হয়েছে।

জমকালো মূর্তি এবার এলিনের পাশে গিয়ে দ্রুত ওকে তুলে নিলো কাঁধে, তারপর বেরিয়ে এলো যে পথে সে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে।

এলিন যদিও ভয় পাচ্ছিলো তবু সে নীরব ছিলো, নিজকে ছেড়ে দিয়েছিলো সে ভাগ্যের উপরে। কে এই জমকালো মূর্তি, আর কেনই বা তাকে এভাবে নিয়ে যাচ্ছে তাও জানার বাসনা অন্তর্ধান হয়েছে তার মন থেকে। নিশ্চুপ অসাড়ের মত চুপ করে রইলো এলিন। সে বুঝতে পারলো, জমকালো মূর্তি যেই হোক তাকে সে হত্যা করবে না।

এলিন একসময় অনুভব করলো তাকে নিয়ে কোনো একটা গাড়িতে তোলা হলো। এলিন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে অশ্বপদ শব্দ খট্ খট্ খট্--তাকে ঘোড়াগাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এলিন আরও বুঝতে পারছে, তার মাথাটা কারো কোলের উপর রয়েছে। কেউ যেন সযত্নে মাথাটা ধরে আছে যেন সে কষ্ট না পায়।

অন্ধকারে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ঘোড়া গাড়িখানা।

এলিন ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে বললো—জল দাও---

জল দেবো, আরও কিছু সময় ধৈর্য ধরো এলিন। বললো জমকালো মূর্তি। কাছে বসলো বনহুর —খাও এলিন, জল খাও।

এলিনের বসবার শক্তি ছিলো না, বনহুর তাহাকে ধরে বসিয়ে পানি পান করালো।

এলিন এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পানি পান করে নিলো।

বনহুর ওকে শুইয়ে দিলো আবার যত্নসহকারে।

এলিন নির্বাক নজরে কিছুক্ষণ বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, কৃতজ্ঞতায় মন তার ভরে উঠেছে কানায় কানায়।

বনহুর বললো— কি দেখছো এলিন?

আপনাকে! আপনি আমাকে না বাঁচালে আজ আমার জীবন প্রদীপ কখন নিভে যেতো---

এলিন, ওসব ভেবে মন অস্থির করোনা, কারণ তুমি এখন অত্যন্ত অসুস্থ। তোমাকে বিশ্রাম করতে হবে অনেক। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আনো। এলিনের চিকিৎসার প্রয়োজন। যাও---

রহমান চলে গেলো।

বনহুর তার জমকালো ড্রেস পাল্টে ফিরে এলো।

এলিন বললো—আসুন আমার পাশে।

এগিয়ে এলো বনহুর।

বললো এলিন—বসুন আমার পাশে।

বনহুর বসলো এলিনের বিছানায়।

এলিন বনহুরের হাতখানা তার জীর্ণ হাতের মুঠায় চেপে ধরলো, বললো—সত্যি আপনি কতবড় মহৎ ব্যক্তি। আপনি আমার জীবনরক্ষক। আপনি আমার সব কিছু মিঃ সোহেল।

এলিন, তুমি সুস্থ হয়ে উঠো।

এখন আমি কোথায় মিঃ সোহেল?

হাউবার্ডের হোটেলে নয়, মরিলা দ্বীপের কোনো এক গোপন স্থানে। এলিন, এখানেও আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই! কারণ হাউবার্ডের মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত কোথাও স্বস্তি নেই। আশঙ্কাহীন নই, বিশেষ করে তোমাকে নিয়ে--

মিঃ সোহেল, আমার জন্য আপনাদের চিন্তার অন্ত নেই।

না এলিন, সে কথা বলছি না, তোমাকে হাউবার্ডের কবল থেকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম। তোমাকে বাঁচাতে চাই এলিন।

মিঃ সোহেল--এলিন বনহুরের বুকে মাথা রাখার চেষ্টা করে কথাটা উচ্চারণ করে।

বনহুর এলিনকে শুইয়ে দিয়ে একটা চাদর টেনে দেয় ওর গায়ে।

একটু পরে রহমান একজন ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসে।

ডাক্তার এলিনের অবস্থা দেখে আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি ভালভাবে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে বিদায় হলেন।

রহমান বললো—সর্দার, মরিলা দ্বীপে অপেক্ষা করা আমাদের উচিত হবে না আর। বিশেষ করে এলিনের জন্য। কারণ হাউবার্ড এখনও জীবিত।

হাঁ রহমান, তোমার কথা সত্য। যদিও হাউবার্ডের একটি হাত নষ্ট হয়ে গেছে তবু সে অসুরের মতই ভয়ঙ্কর। এলিনকে নিয়ে মরিলা দ্বীপে অপেক্ষা করা যায় না কিন্তু হাউবার্ডকে জীবিত রেখে যাওয়াও সম্ভব নয়, বুঝলে? রহমান, এক কাজ করো।

বলুন সর্দার?

তুমি এলিনকে নিয়ে কান্দাই ফিরে যাও, আমি হাউবার্ডকে তার পাপের উপযুক্ত সাজা দিয়ে--

সর্দার, মাফ করবেন, আপনাকে একা রেখে আমি কান্দাই ফিরে যাবো না।

রহমান, তা হয় না। যেমন করে হোক এলিনকে বাঁচাতেই হবে।

সর্দারের কথার পর কোনো কথা বলতে পারে না রহমান নিশ্চুপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রহমান এলিনকে যতই সমীহ করুক কিন্তু সর্বান্তঃকরণে তাকে গ্রহণ করতে পারছিলো না। এলিনের সান্নিধ্য দস্যু বনহুরকে কোনোরকম মোহমুগ্ধ করে, এটা সে সহ্য করতে পারে না। অবশ্য এলিনের সঙ্গে রহমানের হিংসা নয়, এটা তার মনের অহেতুক একটা দ্বন্দ্ব।

কয়েক দিনের মধ্যেই এলিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।

ডাক্তারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আর বনহুরের সেবা-যত্নে এলিন ফিরে পেলো তার স্বাভাবিক জীবন।

এলিনের জন্য রহমানও যে করেনি তা নয়, সেও সর্দারের আদেশে এলিনের অনেক কাজ করেছে। এলিন যে একেবারে চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিলো—মুখে দুধের গেলাসটা তুলে না ধরলে খাবার কোনো উপায় ছিলো না ওর।

বনহুরই অবশ্য এলিনকে খাবারটুকু খাইয়ে দিতো।

রহমান একদিন বলেছিলো—সর্দার, একটা নার্স রাখলে হয় না?

বনহুর বলেছিলো—হয়, কিন্তু আমি চাই না আমরা এখানে আছি সেটা বাইরে প্রকাশ পায়। ডাক্তারের মুখ আমি বন্ধ করে দিয়েছি, সে কিছুতেই আমাদের সন্ধান কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

এরপর রহমান আর এ ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি।

এখন এলিন সম্পূর্ণ সুস্থ।

সেদিন রহমান বাইরে গেছে।

বনহুর তার কক্ষে বসে একটা বই পড়ছিলো, কিন্তু বইয়ের পাতায় তার মন ছিলো না—ভাবছিলো এলিনের কথা। হাউবার্ড হত্যার পর তাকে কান্দাই ফিরে যেতে হবে। অনেক কাজ তার কান্দাই জমা হয়ে রয়েছে। এলিনকে নিয়ে যত সমস্যা। ওকেও নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে—বড় অসহায়

অনাথ মেয়ে এলিন। নূরী আর নাসরিন একে কেমনভাবে গ্রহণ করবে কে জানে--

বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়—কেউ যেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হয়ে বলে—এলিন তুমি!

একা একা ভাল লাগছিলো না, তাই এলাম--

তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নও এলিন। এখানে আসাটা তোমার সমীচীন হয়নি।

মিঃ সোহেল, আপনিও চলুন আমার কক্ষে।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর বলে—চলো।

এলিন বনহুরের হাত ধরে এগিয়ে যায়।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরে এলিন—মিঃ সোহেল, আমি বড্ড অসুস্থ বোধ করছি। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিন--

বনহুর ওকে ধরে ফেললো দ্রুতহস্তে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রহমান প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে। বনহুর আর এলিন দেখবার পূর্বেই সে আলগোছে বেরিয়ে গেলো পিছন থেকে। রহমান কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো বটে কিন্তু তার মুখমন্ডল রাগে ক্ষোভে রাঙ্গা হয়ে উঠলো। রহমানের মনে সন্দেহের ছায়া রেখাপাত করলো।

রহমান নিজ কক্ষে গিয়ে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী শুরু করলো। ভেবে চললো যা সে দেখলো তা কি সত্য! সর্দার কি সত্যিই এলিনকে নিয়ে প্রেমখেলা শুরু করেছেন? না, তা হতে পারে না। সর্দার কোনোদিন এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারেন না। কিন্তু কি করে নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করবে। সে নিজে দেখেছে এলিন সর্দারের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ। তবে সর্দার কেন তাকে বলেছিলেন এলিনের সঙ্গে তিনি প্রেমের অভিনয় করেছিলেন হাউবার্ডের গোপন রহস্য জেনে নেওয়ার জন্য। এখন তাহলে কি উদ্দেশ্যে এ অভিনয়।

হঠাৎ রহমান উত্তেজিত হয়ে উঠলো, সে আর একটি দিন এখানে অপেক্ষা করবে না। আজই সর্দারের অনুমতি নিয়ে চলে যাবে সে কান্দাই। তার পূর্বেই ওয়্যারলেসে জানিয়ে দেবে সব কথা নূরীর কাছে।

রহমান তার কক্ষের গোপন একটা স্থানে বসে ওয়্যারলেসের যন্ত্র খুলে বসলো। নূরীর সঙ্গে কথা হলো রহমানের---নূরী, যে কাজে আমরা এসেছি তা এখনও শেষ হয়নি।-- কাপালিক হত্যা করা হয়নি। তাকে কাবু করা হয়েছে মাত্র।

নূরীর ব্যাকুল কণ্ঠ---হুর কোথায়---সে একটি দিনও আমার সঙ্গে কথা বললো না কেন--সে কি সব সময় ব্যস্ত--

রহমান জবাব দিলো ---সর্দার ব্যস্তই বটে---কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে চলেছে---

নূরীর প্রশ্ন---ঘটনা---কিসের ঘটনা---বলো বলো---রহমান--বনহুরের তো কোনো অমঙ্গল হয়নি--

রহমান বললো ---না, আল্লার রহমতে তার কোনো অমঙ্গল হয়নি নূরী--

নূরীর কণ্ঠ---কোথায় এখন আমার হুর--

রহমান চাপাস্বরে বললো--সর্দার এখন পাশের কক্ষে --নূরী, একটা অবিশ্বাস্য কথা---হয়তো তুমিও বিশ্বাস করবে না--সর্দার একটা যুবতীর প্রেমে পড়েছে---তাকে নিয়েই পাশের কামরায় সর্দার--

খপ্ করে রহমানের হাতের মুঠা থেকে বনহুর কেড়ে নেয় ওয়্যারলেস সাউন্ড বক্সটা। কখন যে বনহুর তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো দেখতে পায়নি রহমান।

রহমান ফিরে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠে।

বনহুর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—রহমান, একি পাগলামি করছিলে? ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে আবার—কার কাছে জানলে তোমার সর্দার একটি যুবতীর প্রেমে পড়েছে?

রহমান নীরব, কোনো উত্তর সে দিতে পারলো না বা মাথা উচু করে তাকাতে পারলো না দস্যু বনহুরের দিকে।

বনহুরও এবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—আমি সব তো খুলেই বলেছি রহমান। কেন তুমি তোমার সর্দারকে অবিশ্বাস করো?

এবার রহমান মুখ তুললো দৃষ্টি বিনিময় হলো সর্দারের দৃষ্টির সঙ্গে। আশ্চর্য হলো রহমান—ঐ চোখে নেই কোনো কুৎসিত লালসার চিহ্ন নেই কোনো পাপময় বাসনার ছায়া। গভীর নীল সুন্দর দুটি চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভাস।

রহমান মাথা নত করে নিলো।

বনহুর বললো—রহমান, জানি এলিনের সঙ্গে আমার মেশাটা সত্যি অশোভনীয় কিন্তু আমি পারছি না ওকে দূরে সরিয়ে দিতে। কারণ যতক্ষণ

না শিকার হাতের মুঠায় পেয়েছি ততক্ষণ টোপ আমাকে ধরে রাখতেই হবে। এলিনকে ছাড়া শয়তান হাউবার্ডকে আয়ত্তে আনা যাবে না। যত গোপন স্থানেই আমি ওকে লুকিয়ে রাখি না কেন, হাউবার্ড তার খোঁজ পাবেই এবং আসবেই সে যে কোনো মুহূর্তে।

রহমান কিছু বলতে চাইলো কিন্তু বলতে পারলো না। লজ্জায় এতোটুকু হয়ে গেছে যেন সে।

বনহুর বললো আবার—এবং এই কারণেই আমি সর্বক্ষণ এলিনকে আগলে থাকি। একটু হাসলো বনহুর, সরলা নারী ও মনে করে আমি ওকে গভীরভাবে ভালবাসি। তাই এলিন নিজেও আমাকে সব সময় পাশে পেতে চায়। রহমান।

বলুন সর্দার?

কার কাছে এ খবর জানাচ্ছিলে তুমি?

রহমান ঢোক গিলে বললো—নূরীর কাছে।

ভালই করেছো। ভাগ্যিস মনিরার কাছে জানাওনি রহমান। আমার বেশি ভয় মনিরাকে।

সর্দার।

হাঁ রহমান, নূরীকে বুঝালে বুঝবে কিন্তু মনিরা বড্ড অবুঝ। এসো রহমান, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রহমান সর্দারের আচরণে অভিভূত হয়ে যায়। সে ভেবেছিলো সর্দার তাকে না জানি কি কঠিন শাস্তি দেবে! এত বড় একটা অপ্রীতিকর কথা বলা কম নয়!

রহমানের মাথা সর্দারের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। তাই তো সে সর্দারকে এতো ভালবাসে, নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসে সে দস্যু বনহুরকে। দস্যু বনহুর স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক উপরে।

❑

হাউবার্ডের মৃতদেহ পুলিশ মর্গ থেকে উধাও হবার পর মরিলা দ্বীপে একটা ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিলো। একে তো কাপালিকের অত্যাচারে মরিলা দ্বীপবাসী অতিষ্ঠ, তারপর এই অদ্ভুত কান্ড। হাউবার্ডের লাশ গেলো

কোথায়, পুলিশ অনেক সন্ধান করেও এর কোনো হদিস সংগ্রহ করতে পারেনি। বনহুর হাউবার্ড সম্বন্ধে জানিয়েছিলো—হাউবার্ড কাপালিক নয়, রক্তখাদক এবং তার জীবনটা অত্যন্ত রহস্যময়। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লোরী হাউবার্ডের জীবন ডায়রী করার জন্য বনহুরকে জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু বলেছিলো—আজ নয়, পরে আপনাকে আমি সব জানাবো।

আজ হঠাৎ পুলিশ সুপার মিঃ লং এবং পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লোরী এসে হাজির হলেন বনহুরের হোটেলের ঠিকানায়।

দিনে একবার করে বনহুর আর রহমান যেতো মরিলা হোটেলে কারণ তারা সবাইকে বলতো হোটেলেই থাকে ওরা। অন্যদিনের মত বনহুর আর রহমান যখন হোটেলে গেছে তখন পুলিশ সুপার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টার ধরে বসলেন। আজ তাঁদের কাছে জানাতে হবে হাউবার্ডের জীবন কাহিনী। তাঁরা পুলিশ ডায়রী করে রাখবেন এই অদ্ভুত লোকটার জীবনী।

বনহুর রাজি হয়ে গেলো।

বসলো ওরা সবাই গোলাকার হয়ে ম্যানেজারের ক্যাবিনে।

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো—আমি যার জীবন কাহিনী আপনাদের জানাবো সে এখন জীবিত আছে।

অস্ফুট কণ্ঠে বললেন পুলিশ ইন্সপেক্টার—হাউবার্ড জীবিত আছে, এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ সোহেল?

হাঁ, সে জীবিত—এ কথা আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। বললো বনহুর।

পুলিশ সুপার বললেন—পাশের জানালার মোটা শিক বাঁকানো দেখে আপনি এ ধারণা করেছেন মিঃ সোহেল। এমনও তো হতে পারে ধরুন কেউ বা কারা জানালার মোটা শিক বাঁকিয়ে সে পথে হাউবার্ডের লাশ উধাও করেছে?

বললো বনহুর—মিঃ লং আপনিই শুধু নন, অনেকেই বলেন এ কথা। কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ আছে যা শুনলে আপনারা বিশ্বাস না করে পারবেন না।

হাউবার্ডের জীবন কাহিনী বলতে গিয়ে এলিনের হরণ কাহিনী এবং তার উদ্ধার পর্যন্ত সব কথা খুলে বললো বনহুর পুলিশ অফিসারদ্বয়ের কাছে। হাউবার্ড জীবিত আছে জেনে পুলিশ সুপার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টার মুখ

কালো করে ফেললেন। কিন্তু মিঃ সোহেলকে তাঁরা ধন্যবাদ জানালেন বারবার করে।

হাউবার্ডের দলকে নিহত করে এলিনকে উদ্ধার করা হয়েছে শুনে অনেক খুশি হলেন তাঁরা। কিন্তু এখনও মরিলা দ্বীপের দুর্যোগ কাটেনি যতক্ষণ না হাউবার্ড সত্যিকারের নিহত হয়েছে।

হোটেলে কথাবার্তা শেষ করে বনহুর আর রহমান তাদের গোপন আস্তানায় ফিরছিলো। একটা ঘোড়ার গাড়িতেই তারা চলেছে।

হঠাৎ পথের মধ্যে একটা ট্যাক্সি তাদের গাড়ির পথ রোধ করে।

বাধ্য হয় কোচোয়ান তার গাড়ি রুখতে।

ঘোড়া গাড়ি থেমে পড়তেই ট্যাক্সি থেকে কয়েকজন লোক নেমে পড়লো। প্রত্যেকের দেহেই আঁটসাট ডোরা কাটা ড্রেস। মাথায় ঝাকরা চুল, চোখে কালো চশমা। এরা কোনো গুন্ডা দল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর চাপাস্বরে বললো—রহমান, গতিক ভাল নয়।

রহমান বললো—সর্দার, পিস্তল বের করবো?

না। চুপ করে বসো, দেখি ওরা কি করে।

ততক্ষণে লোকগুলো ঘোড়ার গাড়িটাকে ঘেরাও করে ফেলেছে। একজন কনিষ্ঠ লোক গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে বনহুরের জামার কলার চেপে ধরলো।

রহমান বিস্ময়ভরা চোখে তাকায়। সর্দার চুপ করে আছেন ব্যাপার কি? সর্দারের ইংগিতের অপেক্ষায় করতে লাগলো রহমান।

লোকটা বনহুরের জামার কলার ধরে গাড়ি থেকে টেনে নিচে নামিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান নিচে নেমে পড়লো তরাস করে।

লোকটা তখন বনহুরকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে গম্ভীর গলায় বললো—বের করো টাকা-পয়সা কি আছে! বের করো বলছি?

বনহুর হাত তুলে দাঁড়ালো—যা পাও নিয়ে যাও তোমরা।

রহমান সর্দারের আচরণে অবাক হয়ে গেছে একেবারে। সে ভেবে পাচ্ছে না সর্দার কিছু না বলে নিরীহ জনের মত ওদের আদেশ পালন করে চলছে কেন? ইচ্ছা করলেই তো সে ওদের কাবু করে নিজের পথ পরিস্কার করে নিতে পারে। সর্দারের এক ঘুষির অপেক্ষা মাত্র---

রহমানের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, আর একজন লোক রহমানকে এসে ধরে—বের করো টাকা -পয়সা?

রহমানের দেহে জ্বালা ধরে গেলো, ইচ্ছা হলো এই মুহূর্তে এদের উপযুক্ত সাজা দেয় কিন্তু সর্দারের জন্য সে কিছু না বলে চুপ করে রইলো।

লোকগুলো বনহুরের দেহে হাতড়ে চলেছে। কারো কারো হাতে ছোরা লাঠিও রয়েছে। অন্ধকারে ছোরাগুলো চক্‌চক্ করছে যেন।

রহমানকেও হাতড়াচ্ছে দু'জন লোক।

বনহুরের পকেট হাতড়ে যেমন লোকটা রিভলভারে হাত দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো ওর নাকে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো লোকটা মুখ থুবড়ে।

সর্দারকে ঘুষি লাগাতে দেখে রহমান উত্তেজিত হয়ে উঠলো, সেও ঘুষি চালালো ভীষণভাবে।

লোকগুলো এবার সবাই মিলে আক্রমণ করলো বনহুর আর রহমানকে।

বনহুর এবার তার দস্যুরূপ ধারণ করলো, যুদ্ধ শুরু হলো ভয়ঙ্করভাবে। রহমান এবং বনহুর দু'জনা আর ওরা সংখ্যায় প্রায় আট দশ জন হবে।

বনহুর এক-এক জনকে বজ্রমুষ্ঠাঘাত দ্বারা কাবু করে ফেললো। ছোরা নিয়ে যারা আক্রমণ করলো বনহুর আর রহমান তাদের হাতে মোচড় দিয়ে ছোরাগুলো কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো দূরে।

লাঠি নিয়ে যারা আক্রমণ করলো, তারা নিজেরাই নিজেদের মাথায় আঘাত করে আহত হলো। বনহুর আর রহমানের সঙ্গে পেরে উঠলো না কেউ। অল্পক্ষণেই ওরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

বনহুর আর রহমান ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলো।

কোচোয়ান এতক্ষণ কোচবাক্সে বসে থরথর করে কাঁপছিলো— সে অবাক হয়ে গেছে, তার গাড়ির আরোহীদ্বয়ের অসীম সাহস আর শক্তি দেখে। মাত্র দু'জনার কাছে এতগুলো লোক পরাজিত হয়ে পালালো—কম কথা নয়!

বনহুর আর রহমান ফিরে আসতেই এলিন ছুটে এলো।

ওদের চেহারা দেখে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো— একি অবস্থা? কোথাও কি যুদ্ধ করে এলেন নাকি মিঃ সোহেল, মিঃ রুহেল আপনারা?

বনহুর তার জামার দিকে তাকিয়ে দেখলো, কয়েক স্থানে ছিঁড়ে গেছে। কোথাও বা রক্তের দাগ লেগে আছে। কোথাও ধূলোবালি লেগে রয়েছে। বনহুর বললো— হাঁ, যুদ্ধই করেছি আমরা।

সত্যি বলছেন?

হাঁ এলিন, ডাকাতের দল আমাদের দু'জনাকে আক্রমণ করেছিলো।

ডাকাতের দল— বলেন কি! ভাগ্যিস্ কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এলিন বনহুরের দেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সমস্ত অন্তর দিয়ে সে যেন বনহুরের ব্যথা অনুভব করছে।

রহমান নিজ কক্ষে চলে গেলো।

এলিন বললো— জামা খুলে ফেলুন মিঃ সোহেল, অনেক জায়গায় আঁচড় লেগে কেটে গেছে, আমি ঔষধ লাগিয়ে দি।

বনহুর বললো— থাক, তেমনভাবে কোথাও কাটেনি এলিন।

না না, আপনার জামার অনেক জায়গায় রক্তের দাগ লেগে আছে, নিশ্চয়ই কেটে গেছে।

অগত্যা বনহুর নিজ দেহের জামা খুলে ফেলতে বাধ্য হলো এলিনের জেদে পড়েই, না হলে সে খুলতো না সহজে। আজও এলিন বনহুরের নগ্নদেহ স্বচক্ষে দেখেনি।

এলিন বনহুরের সুন্দর সুঠাম বলিষ্ঠ শরীরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলো। সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না এলিন।

বনহুর এলিনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, তারপর বললো— কই, ওষুধ লাগিয়ে দাও?

এলিন ওষুধের শিশি আর তুলো হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। নিজের হাতে বনহুরের দেহের সামান্য ক্ষতগুলোতে যত্ন-সহকারে ওষুধ লাগিয়ে দিতে লাগলো।

ওষুধ লাগিয়ে দেবার সময় এলিন আলগোছে চুম্বন করলো বনহুরের পিঠে। বললো এলিন— মিঃ সোহেল, সত্যি আপনি অপূর্ব.....

বনহুর হাসলো, কোনো জবাব দিলো না এলিনের কথায়।

এলিন বললো আবার— আপনার পৌরুষদীপ্ত চেহারা, আপনার শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে, মিঃ সোহেল.....

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো— এলিন!

আপনাকে পেয়েছি আমি, এ আমার পরম সৌভাগ্য। মিঃ সোহেল, একটা কথা বলবো?

বলো?

আপনি আমাকে ভালবাসেন কিনা জানতে চাই। এলিন দু'হাতে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

বনহুর বলে— আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি এলিন। তোমাকে ভালবাসি বলেই তো আজও আমি মরিলা দ্বীপে পড়ে আছি।

বনহুর এলিনকে খুশি করবার জন্যই কথাগুলো বললো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া এলিনের মত সরল-স্বাভাবিক একটা মেয়েকে ব্যথা দিতে মন তার চাইলো না।

❑

পাশাপাশি দু'টো বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন দস্যু বনহুর আর এলিন। আজকাল বনহুর এলিনকে নিজ কক্ষেই রাখে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে এলিনের বিপদ ঘটতে পারে। হাউবার্ড যে হানা দেবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সে জন্যই বনহুর এলিন ব্যাপারে সদা-সর্বদাই সজাগ থাকতো।

আজও বনহুর জেগেছিলো, হঠাৎ কখন যে একটু নিদ্রা এসেছে সে জানে না।

রহমান কিন্তু ঘুমাতে পারেনি, সে নিজের বিছানায় শয়ন করে লক্ষ্য করছিলো সবকিছু। সর্দার নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো, এটাও রহমান তীক্ষ্ণভাবে খেয়াল করেছে। বিশেষ করে এ মুহূর্তে তাকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে।

বনহুর আর এলিনের বিছানা পাশাপাশি ছিলো।

রহমান শয়ন করতো কিছুদূরে অন্য একটি শয্যায়।

প্রথমে কয়েক দিন এ কক্ষে একটি শয্যা ছাড়া কোনো শয্যা ছিলো না। তখন এলিনকে এই শয্যায় শয়ন করতে দিয়ে বনহুর নিজে সোফায় শয়ন করতো।

রহমান শয়ন করতো পাশের কামরায়।

কয়েক দিন হলো বনহুর নিজে এ ব্যবস্থা করেছে।

এলিনকে সদা দৃষ্টিপথে রাখাই শুধু বনহুরের মূল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এলিনকে রক্ষা করা এবং কাপালিক শয়তান হাউবার্ড কে হত্যা করা।

হাউবার্ড নিহত হলেই বনহুর মরিলা দ্বীপ ত্যাগ করবে। এখানকার কাজ তার শেষ হবে।

বনহুর শুয়ে শুয়ে কান্দাই আস্তানার কথা ভাবছিলো তারপর কখন যে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে, সে নিজেই জানে না।

রহমান বালিশের তলা থেকে রিভলভার বের করে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ভয় হয় সে আবার ঘুমিয়ে না পড়ে। রিভলভার হাতে নিয়ে বনহুর আর এলিনের শিয়রে পায়চারী করতে থাকে সে। বারবার হাই তুলতে থাকে রহমান।

নিদ্রায় দু'চোখ জড়িয়ে আসছে যেন ওর।

আপন মনে পায়চারী করছে রহমান—দক্ষিণ হস্তে রিভলভার, বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ।

হঠাৎ একটা শব্দে রহমান চমকে উঠলো। বিদ্যুৎগতিতে ফিরে তাকালো ওপাশের বন্ধ জানালার দিকে। বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলো সে, জানালার ফাঁকে দু'খানা হাত জানালার মোটা মোটা লোহার শিকগুলোকে বাঁকিয়ে ফেলছে!

রহমান মুহূর্তে বনহুরের শয্যার পাশে এসে মৃদু ধাক্কা দিলো তার দেহে, চাপাস্বরে বললো— সর্দার...সর্দার...

বনহুর উঠে বসলো দ্রুতগতিতে, তারপর বললো— রহমান, কি ব্যাপার?

আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো রহমান ওদিকের জানালাটা।

বনহুর ওদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো না, সে রহমানসহ দ্রুত আড়ালে সরে দাঁড়ালো। বনহুর রিভলভারখানা চেপে ধরলো দক্ষিণ হস্তে।

অল্পক্ষণেই জানালার শিকগুলো বাঁকা হয়ে গেলো। একটা মাথা প্রবেশ করলো সন্তর্পণে।

বনহুর আর রহমান দেয়ালের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে রইলো, তাদের হাতের রিভলভার দুটি উদ্যত রয়েছে।

রহমান চাপাস্বরে বললো— সর্দার, হাউবার্ড স্বয়ং.....

হাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি। ওকে ভিতরে প্রবেশ করতে দাও।

হাউবার্ড তখন বাম হস্তে সূতীক্ষ ধার ছোরাসহ জানালাপথে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে।

এগিয়ে আসছে হাউবার্ড এলিনের বিছানার দিকে।

রহমান কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

বনহুর ওর মুখে হাতচাপা দিয়ে তাকে কথা বলতে বারণ করলো।

হাউবার্ডকে ঠিক অসুরের মতই মনে হচ্ছে। গেঞ্জি গায়ে, পুরানো একটা রং-উঠা ফুলপ্যান্ট। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, মুখেও খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। ডান হাতখানায় ব্যান্ডেজ জড়ানো।

বনহুর বুঝতে পারলো, সেদিন তারই গুলীতে হাউবার্ডের এই অবস্থা হয়েছে। লোকটার দুঃসাহস কম নয়, একটি মাত্র হাত নিয়ে এসেছে এলিনকে হরণ করতে।

বনহুর দেখলো, এটাই একমাত্র সুযোগ, সে এক লাফে এসে পড়লো হাউবার্ডের সম্মুখে— খবরদার, এগুবে না হাউবার্ড।

চমকে উঠলো হাউবার্ড কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, মুহূর্তে দেহে এক ঝাকি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। হুঙ্কার ছাড়লো— এলিন কোথায়?

ততক্ষণে রহমান এলিনের পাশে গিয়ে রিভলভার উদ্যত করে দাঁড়িয়েছে।

হাউবার্ডের বজ্রকণ্ঠে জেগে উঠেছে এলিন। সে ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে বনহুর আর হাউবার্ডের দিকে! হাউবার্ড এলিনকে দেখে ভীষণ হয়ে উঠলো। বনহুরকে আক্রমণ করলো সে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত।

বনহুর সেই দন্ডে সরে দাঁড়ালো।

হাউবার্ড হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে। দক্ষিণ হাতে বুঝি আঘাত লেগেছিলো তাই মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলো যন্ত্রণায়। বনহুর সেই সুযোগে হাউবার্ডের বাম হাত লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা ছিটকে পড়লো দেয়ালের পাশে।

হাউবার্ড গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বাম হাতখানা ঝুলে পড়েছে— রক্ত ঝরছে ঝরঝর করে। হাউবার্ডের মুখ কালো হয়ে উঠেছে।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো— হাউবার্ড, তুমি শুধু নর হত্যাকারীই নও, তুমি শয়তান! তাই তোমাকে হত্যা করে আমি মুক্তি দেবো না। তোমাকে ধুকে ধুকে মারবো।

হাউবার্ড বিকৃত কণ্ঠে বললো—মিঃ সোহেল, তুমি— তুমিই আমাকে এইভাবে নাকানি-চুবানি খাওয়ালে! আমি.....

কিন্তু সে সুযোগ তুমি পাবে না হাউবার্ড— হাঃ হাঃ হাঃ.... হেসে উঠলো বনহুর অদ্ভুতভাবে।

রহমান আর এলিন তখন বনহুরের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করছিলো। হাউবার্ড গরিলার মত ভীষণ আকারের দেহটা দুলিয়ে বনহুরের দিকে অগ্রসর হলো, দাঁত দিয়ে কাঁমড়ে দেবে সে বনহুরকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের রিভলভার গর্জে উঠলো, গুলীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই হাউবার্ডের বিরাট দেহটা গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো, যেন ঠিক আহত সিংহের গর্জন। বারকয়েক গড়াগড়ি দিয়ে নীরব হয়ে গেলো দেহটা। বনহুর এবার এলো হাউবার্ডের পাশে, পা দিয়ে উল্টে চিৎ করে দিলো ওর দেহটা, তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো বনহুর আপন মনে—হাঃ হাঃ হাঃ.....

এলিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, এমন করে মিঃ সোহেলকে সে হাসতে দেখেনি কোনোদিন।

রহমান নীরবে তাকিয়ে রইলো, সে খুব খুশি হয়েছে। হাউবার্ড নিহত হওয়ায় এবার তারা নিশ্চিন্ত।

বনহুর হাসি বন্ধ করে বললো— এলিন, আজ থেকে মরিলা দ্বীপ পাপমুক্ত হলো। হাউবার্ড আর জীবিত হবে না। রহমান, যাও পুলিশ অফিসে গিয়ে সংবাদ দাও, শয়তান হাউবার্ড এবার সত্যি সত্যি নিহত হয়েছে।

রহমান বেরিয়ে গেলো সর্দারের আদেশ পেয়ে।

এলিন বনহুরের বুকে মাথা রেখে বললো— মিঃ সোহেল, আপনি আমাকে বাঁচালেন। আমাকে রক্ষা করলেন.....

বনহুর এলিনের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো— এবার তুমি নিজকে রাহুমুক্ত মনে করতে পারো এলিন।

অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশ সুপার, পুলিশ ইন্সপেক্টার, আরও অন্যান্য বনহুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন— অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিঃ সোহেল। আপনার চেষ্টায় আজ মরিলা দ্বীপবাসী নবজীবন লাভ করলো। আপনি শয়তান কাপালিক হাউবার্ডকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন, এজন্য আপনাকে আমরা পুরস্কৃত করবো।

বনহুর হেসে বললো— মিঃ লং, পুরস্কারের লোভ আমার নেই। আপনি সেই অর্থ মরিলা দ্বীপবাসীর অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন!

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন পুলিশ অফিসারগণ মিঃ সোহেলবেশী দস্যু বনহুরের মুখের দিকে। অদ্ভুত মানুষ এই মিঃ সোহেল, ভাবেন তারা মনে মনে।

এরপর বিদায়ের পালা।

মরিলা দ্বীপের কাজ শেষ হয়েছে, বনহুর আর রহমান এবার মরিলা দ্বীপ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি নিলো, সমস্যা হলো এলিনকে নিয়ে।

এলিন নিঃসহায় অনাথা মেয়ে। মরিলা দ্বীপে তার কেউ নেই, সে এলিনকে আশ্রয় দেবে। তাছাড়া এলিন তার ছোটবেলার কিছু বলতে পারে না, কোথায় তার দেশ, কে তার বাবা-মা, কিছুই সে জানে না।

বনহুর ওকে নিয়ে চিন্তিত হলো। কান্দাই আস্তানায় নিয়ে গেলে নূরী ওকে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। বিশ্বাসও করবে না কোনো রকমে।

অনেক ভেবেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতো সক্ষম হলো না। এলিনের সম্মুখে রহমানকেও কিছু বলতে পারছে না বনহুর।

বনহুরকে চিন্তামগ্ন দেখে রহমান বুঝতে পারলো, সর্দাররের মনে কিসের যেন একটা অশান্তি জটলা পাকাচ্ছে। একসময় সে বললো— সর্দার, আপনি কোনো ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে?

হাঁ রহমান, অত্যন্ত ভাবনায় আছি। একটু থেমে বললো— এলিন কোথায়?

এলিন বাগানে।

বসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

রহমান পাশের চেয়ারে বসে পড়লো।

বনহুর সিগারেট-কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো— কাল ভোরে আমরা মরিলা দ্বীপ ত্যাগ করবো কিন্তু সমস্যা হলো এলিনকে নিয়ে। রহমান, এলিনকে নূরী কিছুতেই গ্রহণ করবে না। সে যে বিভ্রাট সৃষ্টি করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রহমান মাথা চুলকে বললো— সে কথা মিথ্যা নয় সর্দার, এলিনকে নিয়ে সমস্যাই হবে।

বনহুর বললো— একটা উপায় করতে হবে তো?

সর্দার, এলিনকে আমাদের শহরের আস্তানায় রাখলে হয় না?

হাঁ, ঠিক বলেছো রহমান, আপাততঃ তাকে কান্দাই আমার শহরের আস্তানায় রাখতে হবে। বনহুর যেন কতকটা আশ্বস্ত হলো এবার।

এমন সময় এলিন এসে পড়লো সেখানে, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো— মিঃ সোহেল, আপনি এখানে? আমি আপনাকে খুঁজে ফিরছি.....চলুন না বাগানে যাই?

বনহুরের হাত ধরে ছোট্ট বালিকার মত আব্দারভরা কণ্ঠে বললো এলিন শেষ কথাটা।

বনহুর একটু হেসে তাকালো রহমানের দিকে, তারপর বেরিয়ে গেলো এলিনের সঙ্গে।

রহমান মাথা নিচু করে হাসলো— সে বুঝতে পারলো, এলিনের আব্দার রক্ষা করতে সর্দার নাজেহাল হয়ে পড়েছে। সর্দার অভিনয় করেছিলো, এলিন ভালবেসে ফেলেছে তাকে গভীরভাবে। ওকে সহসা এড়ানো বড় মুস্কিল হবে এখন।

❑

কান্দাই পৌঁছে বনহুর রহমান আর এলিনসহ সর্বপ্রথম বনহুরের শহরের আস্তানায় গেলো। সেখানে এলিনকে রেখে বললো বনহুর— এখানে তুমি থাকবে এলিন, এরা সবাই তোমাকে সমীহ করে চলবে। তোমার আদেশ পালন করবে।

এলিন বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বললো— আপনি? আপনি থাকবেন না এখানে?

আপাততঃ আমাকে যেতে হবে এলিন। আমার অনেক কাজ আছে। মাঝে মাঝে এসে তোমার সংবাদ নেবো।

এলিন আরও এঁটে ধরে বনহুরের জামাটা— না, আমি আপনাকে যেতে দেবো না মিঃ সোহেল।

এলিন, তুমি ছেলেমানুষি করো না। কথা দিলাম, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

আপনি আসবেন তো?

হাঁ, আসবো। মিঃ রুহেলও এসে সংবাদ নেবে তোমার।

শেষ পর্যন্ত এলিন রাজি হলো, বনহুরের জামার আস্তিন ছেড়ে দিয়ে বললো— আচ্ছা যান, তবে না এলে আমি কিন্তু কেঁদে একাকার করবো।

হাসলো বনহুর, তারপর বেরিয়ে গেলো রহমানসহ।

পাশাপাশি গাড়িতে বসেছিলো বনহুর আর রহমান। বনহুর স্বয়ং ড্রাইভ করছে। রহমান নীরবে তাকিয়ে ছিলো বাইরের দিকে।

নির্জন প্রশস্ত পথ।

সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা। জমাট অন্ধকারে পৃথিবী এখনও আচ্ছন্ন হয়নি। আকাশে পাখির ঝাঁক ফিরে চলেছে নিজ নিজ আবাসে।

পথের দু'ধারে শস্যশ্যামল ধান ক্ষেতের উপরে বেলা শেষের ম্লান আলোকরশ্মি এখনও মিশে যায়নি। বনহুরের গাড়ি স্বাভাবিক গতিবেগে এগিয়ে চলছে।

হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার কানে আসে বনহুর আর রহমানের। করুণ প্রাণফাটা সে চিৎকার—বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছো বাঁচাও.....

বনহুর মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে ফেললো।

রহমান বললো—সর্দার, কেউ বাঘের কবলে পড়েছে। দেখছেন না ওদিকে গভীর জঙ্গল!

বনহুর বললো—এসো দেখা যাক কি ব্যাপার।

বনহুর রিভলভার বের করে নিলো হাতের মুঠায়।

রহমানও প্রস্তুত হলো, গুলী ভরে নিলো রিভলভার।

বনহুর দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে ছুটলো জঙ্গল লক্ষ্য করে, রহমান তাকে অনুসরণ করলো।

জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করতেই বনহুর দেখলো, কায়েকজন লোক একটা লোককে ভূতলে ফেলে তার দেহের নানা স্থানে অস্ত্রাঘাত করে চলেছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুঁড়লো কিন্তু গুলী কারো দেহে বিদ্ধ হবার পূর্বেই সবাই জঙ্গলমধ্যে গা ঢাকা দিলো। এতো দ্রুত লোকগুলো অদৃশ্য হলো তাতে বনহুর আর রহমান স্তম্ভিত না হয়ে পারলো না। অতি দক্ষ শয়তান দল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর আর রহমান তাড়াতাড়ি এসে দেখলো লোকটার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে চিৎ হয়ে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো, মৃতদেহটার পাশে পড়ে আছে একখানা কাগজের টুকরা।

বনহুর কাগজখানা খুলে মেলে ধরলো, মাত্র দুটি লাইন লেখা রয়েছে কাগজখানায়—

মতিচুর মালা পাঠালাম।

মালাটা নিয়ে একেবারে খতম করে দেবে,
তাহলেই সব কথা বন্ধ হয়ে যাবে, বুঝলে?
চিঠিখানা পড়ে ছিঁড়ে ফেলো।

তোমাদের—
বন্ধু
মো...ন

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো অস্ফুট কণ্ঠে বললো— কান্দাই ফিরে না আসতেই একটা শয়তানের পাল্লায় পড়লাম। চলো রহমান, এখানে এক মুহূর্ত বিলম্ব করা ঠিক নয়।

চলুন সর্দার। কিন্তু লাশটা.....

ওটার কোনো প্রয়োজন নেই।

বনহুর আর রহমান ফিরে এলো গাড়ির পাশে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে।

বনহুর চালকের আসনে বসলো।

উল্কা বেগে গাড়ি ছুটলো।

বনহুর বললো— রহমান, এক্ষণে আমি আস্তানায় ফিরে যাবো না।

তাহলে কোথায় যাবেন সর্দার?

আপাততঃ কান্দাই শহরের বিভিন্ন রাস্তায়। কারণ আমাদের গাড়িখানাকে কেউ ফলো করতে পারে।

হাঁ সর্দার, ঠিক বলেছেন।

বনহুর গাড়ি ব্যাক করে আবার অন্য পথ ধরে।

রহমান বললো— সর্দার, এই হত্যাকাণ্ডটা.....

হাঁ, রহমান, অত্যন্ত রহস্যজনক। বহুদিন আমি কান্দাই ত্যাগ করে বাইরে ছিলাম, তাই আবার এমনি কত শয়তান মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার হিসাব নেই। আমাকে আবার পাপকাজে নিযুক্ত হতে হবে রহমান।

সর্দার!

পাপ মানে অন্য কিছু কুৎসিত কাজ নয় রহমান। কতগুলো লোক প্রাণ হারাবে অহেতুক.....

সর্দার, এটা অহেতুক নয়। আমি জানি, আমার সর্দার কোনোদিন অহেতুক কারো প্রাণনাশ করেন না! সর্দার, আমি একটা কথা বলতে চাই!

বলো?

মতিচুর মালা, সেকি সর্দার?

এ মালা অত্যন্ত মূল্যবান। লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি এর দাম, বুঝলে?

সর্দার, চিঠিখানা পড়ে আপনি কি বুঝলেন?

কোনো শয়তান তার দলের কাছে এই মতিচুর মালা লোক দ্বারা প্রেরণ করে এবং তারই হাতে বন্ধ করা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়, মালা গ্রহণ করার পর তাকে যেন হত্যা করা হয়। তাঁ, লোকটা সত্যিই নির্বোধ, নাহলে অমন করে প্রাণ হারাতো না। টাকার লোভেই যে সে এ কাজ করতে সম্মত হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই।

সর্দার, নিচের নামটা?

নামটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে রহমান। অতি সংক্ষেপে শয়তান তার নাম সই করেছে...তারপর ফাঁক রেখে...নাম লিখেছে। আগের এবং শেষ অক্ষর ব্যবহার করেছে।

গাড়িখানা তখন ফিরে এসেছে আবার কান্দাই শহরের বুকে।

বনহুর বললো আবার— রহমান, আর কতক্ষণ এভাবে পথে পথে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াবো?

সর্দার, আমার মনে হচ্ছে কেউ আমাদের ফলো করেনি।

তোমার মনের কথা সত্য নয় রহমান। আমাদের গাড়ি-খানাকে কোনো নিপুণ সন্ধানী গাড়ি ফলো করছে। তুমি অপেক্ষা করো, আমি অল্পক্ষণেই তোমাকে এর প্রমাণ দেখিয়ে দেবো।

বনহুরের কথায় রহমান অত্যন্ত আশ্চর্য হলো। কারণ, সে লক্ষ্য করেছে, এতোক্ষণ তাদের গাড়িখানার পিছনে এক নাগাড়ে কোনো গাড়িই অগ্রসর হয়নি যাতে কোনো সন্দেহ জন্মাতে পারে।

বনহুর গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিলো।

গাড়িখানা এখন জনবহুল রাজপথ বেয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো, দু'পাশে অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোক সুসজ্জিত দোকান, রেষ্টুরেন্ট, সিনেমা হল এবং হোটেল।

বনহুরের গাড়ির পাশ কেটে চলে যাচ্ছে নানারকম যানবাহন।

বনহুর গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিতেই একখানা ধূসর রংএর গাড়ি তাদের গাড়িখানার পাশ কেটে চলে গেলো।

বনহুর বললো— দেখলে, যে গাড়িখানা এই মুহূর্তে চলে গেলো সেখানাই আমাদের গাড়িকে ফলো করছিলো এতক্ষণ।

রহমান বললো— তাহলে এতক্ষণ আমরা ঐ গাড়িখানা দেখতে পাইনি কেন সর্দার?

হাঁ, বলতে ভুল হয়েছে আমার। আসলে আমাদের গাড়িখানাকে ঐ ধূসর রং-এর গাড়িখানা ফলো করেনি, করেছিলো গাড়ির ভিতরের লোক। বার বার তারা গাড়ি বদল করে আমাদের অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। চলো রহমান, এখন আমরা সম্মুখে বার-এ গিয়ে হাজির হই। কতদিন নাচগান দেখিনি শুনিনি।

রহমান কিছু না বলে নীরবে রইলো।

বনহুর তার গাড়িখানাকে বার-এর সম্মুখে রেখে নেমে পড়লো।

রহমান লক্ষ্য করলো, একটু পূর্বে যে গাড়িখানা তাদের পাশ কেটে চলে গিয়েছিলো বার-এর অদূরে, সেই-গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর আর রহমান প্রবেশ করলো ভিতরে।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই শুনতে পেলো নানারকম হাসি আর গল্পের আওয়াজ। আরও দেখলো, অগণিত নারী-পুরুষ প্রত্যেকটি টেবিলে জটলা করে বসে আছে। সম্মুখে নানারকম খাদ্যসম্ভার, মদের বোতল আর কাঁচের গেলাস রয়েছে।

বনহুর একটা খালি টেবিল দেখে বসে পড়লো। রহমানকেও বসার জন্য ইংগিত করলো।

বনহুর আর রহমান আসন গ্রহণ করতেই বয় এসে কিছু ফলমূল আর মাংস রেখে বললো— শরাব চাই স্যার?

বনহুর প্লেট থেকে ছুরি আর একটা আপেল হাতে উঠিয়ে নিয়ে বললো— নিয়ে এসো।

বয় চলে গেলো।

রহমান জানে, তার সর্দার কোনোদিন শরাব স্পর্শ করেন না। হয়তো এটাও তাঁর অভিনয়। রহমান একখানা ছুরি আর একটা ফল হাতে তুলে নিলো।

বয় শরাব এনে রাখলো টেবিলে, আর কাঁচের দুটো গেলাস।

চলে গেলো বয়।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর— রহমান, ওদিকে টেবিলে তিনজন লোক আমাদের দেখছে।

রহমান সর্দারের কথায় সোজাসুজি না তাকিয়ে একটা আপেল মেঝেতে ফেলে দিলো, তারপর ফিরে তুলে নেবার সময় তাকিয়ে দেখলো, সত্যিই তিনজন লোক তাদের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন বলা বলি করছে। এবার একজন উঠে চলে গেলো বার-এর ভিতরে।

বনহুর বললো— রহমান, ওরা কোনো মতলব নিচ্ছে। উদ্দেশ্য মোটেই ভাল নয়।

রহমান বললো— এখানে বিলম্ব না করে.....

তুমি জানো না রহমান, আমি কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি। এই হোটেল-বারই হলো সেই মো...ন'র আসল আড্ডাখানা। নাও, খেতে শুরু করো.. ..কথার ফাঁকে বনহুর ফল কেটে মুখে ফেলতে থাকে।

রহমানও খেতে আরম্ভ করলো।

এমন সময় মুখে পাতলা আবরণ জড়ানো একটা সুন্দরী তরুণী নর্তকী সিঁড়ি বেয়ে নাচতে নাচতে নেমে আসে বার এর মেঝেতে।

এক-সঙ্গে সকলের দৃষ্টি চলে যায় সিঁড়ির নিচের দিকে।

নর্তকী তখন নাচের তালে তালে সুরের ঝঙ্কার সৃষ্টি করে নেমে আসছে।

বনহুর আর রহমান অবাক চোখে তাকালো।

নর্তকী নেমে এলো নিচে।

ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা টেবিলের পাশে যাচ্ছে নর্তকী আর গানের ঝঙ্কার তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সকলের। কারো টেবিল থেকে মদের বোতল তুলে নিয়ে ঢেলে দিচ্ছে নিজের মুখে, আবার কখনও বা ঢেলে দিচ্ছে টেবিলের পাশে বসা পুরুষগুলোর মুখ-গহ্বরে।

বনহুর বললো— রহমান, এরা অত্যন্ত চালাক লোক। দেখলেনা লোকটা উঠে গিয়ে কেমন ট্রেনিং দেওয়া একজন নর্তকীকে এনে হাজির করলো।

তাইতো দেখছি সর্দার। বড় বদমাইশ এরা। ঐ দেখুন সর্দার, যে লোকটা ভিতরে উঠে গিয়েছিলো, আবার সে ফিরে এসে নিজের আসন গ্রহণ করলো।

হাঁ, ওরা বারবার আমাদের দু'জনাকে লক্ষ্য করছে। কু'মতলব আছে এটা নিঃসন্দেহ।

ঠিক সেই মুহূর্তে নর্তকীটা নাচের তালে তালে এসে বনহুরের টেবিল থেকে শরাবের বোতলটা তুলে নিলো হাতে, তারপর বোতল থেকে খানিকটা শরাব গেলাসে ঢেলে এগিয়ে ধরলো বনহুরের মুখের কাছে।

বনহুর বিলম্ব না করে খপ করে ধরে ফেললো নর্তকীটির গেলাসসহ হাতখানা। ঝাকি লেগে খানিকটা শরাব পড়ে গেলো টেবিলের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীর কণ্ঠে গানের সুরও থেমে গেলো দমকা হাওয়ার নিভে যাওয়া প্রদীপের মদ দপ করে।

বনহুর নর্তকীর হাতখানা ধরে ফেলতেই ওপাশে টেবিলে বসা লোক তিনজন ধাঁ করে ছুটে এলো। কেউ বা ছোরা বের করলো বিদ্যুৎগতিতে।

বনহুর ধীর গতিতে উঠে দাঁড়ালো। তখনও তার হাতের মুঠায় নর্তকীর গেলাসসহ হাতখানা রয়েছে।

নর্তকী একবার তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে, একবার অন্যান্য লোকগুলোর মুখে যারা ক্রুদ্ধ শার্দুলের মত ছুটে এসে টেবিলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

রহমানও উঠে দাঁড়িয়েছে, বারবার তার হাতখানা প্যান্টের পকেটে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো।

সর্দার পকেটে হাত প্রবেশ করার চেষ্টা করছে না দেখে সেও নিশ্চুপ রয়েছে।

হঠাৎ একজন ছোরা উদ্যত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের উপর, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ওর ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেলে এবং প্রচন্ড এক লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ওকে দূরে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে আর একজন আক্রমণ করে বনহুরকে, তাকেও বনহুর প্রচন্ড এক ঘুষি দিয়ে ধরাশায়ী করে।

ততক্ষণে রহমানের সঙ্গেও তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

বার-এর মধ্যে চললো সেকি ভীষণ ধস্তাধস্তি! বনহুরের প্রচন্ড ঘুষি খেয়ে এক একজন মরিয়া হয়ে উঠলো। কে কোন্ দিকে পালাবে যেন দিশে রইলো না।

বনহুর একজনকে ধরাশায়ী করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করলো, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠস্বর— বন্ধু, অত ক্ষেপেছো কেন? ওরা তো সব নেংটি ইঁদুর!

ফিরে তাকালো বনহুর, দেখলো একটা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে তার কাঁধে হাত রেখে।

রহমান একজনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত ছিলো, সে তার বিপরীত জনকে ভূতলে ফেলে ছোরা বসিয়ে দিতে গেলো তার বুকে।

বনহুর বললো— ছেড়ে দাও রহমান।

রহমান তৎক্ষণাৎ সর্দারের আদেশ পালন করলো, উঠে দাঁড়ালো রহমান ভূতলশায়ী লোকটার বুকের উপর থেকে।

বনহুর নিজের কাঁধ থেকে লোকটার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো— ওরা নেংটি ইঁদুর। তুমি কে বন্ধু?

একটু হেসে বললো লোকটা— আমি কে, তাই না?

হাঁ, তুমি কে জানতে চাই?

আমি এই বার-এর মালিক।

তা তোমার পোষা নেংটি ইঁদুরগুলো অত বেয়ারা কেন?

আমার পোষা নয়, ওরা বাইরের লোক।

বনহুর জামাটা গুটিয়ে নিয়েছিলো লড়াই-এর পূর্বে। এবার সে হাতলের আস্তিন মেলে দিতে দিতে বলে— তাই বলো, তোমাকে দেখে বেশ ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে, আর ওরা একেবারে যা-তা.....

ঠিকই বলেছো ভাই। লোকটা গদগদ কণ্ঠে বললো।

ভাই নয়, বন্ধু বলো। তীব্র কণ্ঠে কথাটা বললো বনহুর। এবার রহমানকে লক্ষ্য করে বললো সে—চলো এবার যাওয়া যাক।

লোকটা শান্তকণ্ঠে বললো—যাবে কেন বন্ধু, বসো তোমরা; খাওয়াতো হয়নি? চলো বন্ধু চলো।

লোকটা বনহুরের হাত ধরে টেবিলের পাশে চেয়ারে বসিয়ে দিলো।

বনহুর আসন গ্রহণ করতেই রহমান নিজেই বসে পড়লো একটা চেয়ার দখল করে নিয়ে।

লোকটা বসে পড়লো।

সমস্ত বার-গৃহ তখন পূর্বের ন্যায় শান্ত আকার ধারণ করেছে।

নর্তকীটা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

লোকটা বললো— বন্ধু, কি খাবে তোমরা?

বনহুর বললো— খাওয়া আমাদের শেষ হয়েছে।

কলিং বেলে হাত রাখলো লোকটা।

তৎক্ষণাৎ বয় ছুটে এলো, দাঁড়ালো টেবিলের পাশে।

লোকটা বললো— মাংস আর খাঁটি জিনিস নিয়ে এসো।

বয় চলে গেলো।

লোকটা হেসে বললো— খাঁটি জিনিস কাকে বলে হয়তো জানো না। এই যে সম্মুখে বোতল দেখছো সব বাজে। এবার আসবে খাঁটি মাল.....

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ওসব আমি খাই না।

লোকটা হো হো করে হেসে উঠলো, সে বনহুরকে সাধারণ কোনো এক শক্তিশালী লোক মনে করেছে এবং সেই কারণেই সে হাসলো অমন করে। তারপর হাসি থামিয়ে বললো— বন্ধু একদিন খেলে তুমি জীবনভর মনে রাখবে। আমাদের এখানে সবরকম মাল আছে।

রহমান চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো সর্দার আর লোকটার কথাবার্তা।

বয় দু'বোতল খাঁটি মাল এনে সামনের টেবিলে রাখলো আর রাখলো মাংসের পাত্র।

বনহুর রহমানকে ইংগিত করলো খেতে।

নিজেও বনহুর মাংস আর কাঁটা-চামচ টেনে নিয়ে মাংস তুলে খেতে আরম্ভ করলো।

রহমান সর্দারের আদেশ পালন করলো, সেও কাঁটা-চামচ তুলে নিলো হাতে।

রহমান খাচ্ছে আর বারবার তাকাচ্ছে সর্দারের মুখের দিকে।

বনহুর আপন মনে খেলো, তারপর বোতল থেকে শরাব ঢেলে গেলাসটা তুলে নিলো হাতে।

রহমান শিউরে উঠলো, কারণ তার সর্দার শরাব পানে অভ্যস্ত নয়। আজ কি সে শরাব পান করবে?

রহমান অবাক হলো, বনহুর ঢকঢক করে শরাব পান করলো।

এক গেলাস নয়, পর পর দু'তিন গেলাস পান করে উঠে দাঁড়ালো জড়িতকণ্ঠে বললো— চলো রহমান। আচ্ছা বন্ধু, আবার দেখা হবে। হাত বাড়িয়ে লোকটার সাথে করমর্দন করলো বনহুর, তারপর বেরিয়ে গেলো।

গাড়ির দিকে এগুলো বনহুর ও রহমান।

বনহুর টলতে টলতে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো।

রহমান ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো তাড়াতাড়ি করে।

কারণ সর্দারের এই মুহূর্তে গাড়ি চালানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

রহমানকে ড্রাইভ আসনে উঠে বসতে দেখে বনহুর গাড়ির সম্মুখ দিয়ে ওপাশে গিয়ে বসলো।

রহমান গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

উল্কা বেগে ছুটলো গাড়িখানা।

❑

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে যেতেই লোকটা টেবিলে প্রচন্ড মুষ্টাঘাত করলো, চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তার।

লোকটা টেবিলে মুষ্টাঘাত করতেই বারগৃহের অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে এলো সেই জোয়ান বলিষ্ঠ চেহারার লোকগুলো। একটু পূর্বে যারা বনহুরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলো।

লোকটা তাদের লক্ষ্য করে পুনরায় টেবিলে মুষ্ঠাঘাত করে বললো— এমন উল্লুক তোমরা, দুটো লোকের সঙ্গে পারলে না? নেংটি ইদুরের দল সব!

লোকগুলো যেন ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলো। কেউ কেউ চোখ তুলে তাকালো ভয়-বিহবল দৃষ্টি নিয়ে। একজন বললো— ওস্তাদ, আপনি জানেন না, লোকদুটো যেন সিংহশাবক। আমাদের বুকের পাঁজর গুঁড়ো করে দিয়েছে।

আর একজন বললো— ওস্তাদ, ঐ প্রথম লোকটার দেহের শক্তি যেন অসুরে শক্তির চেয়ে বেশি। এই দেখুন ওস্তাদ; আমার চোয়াল থেতলে দিয়েছে।

হুঙ্কার ছাড়লো লোকটা— তোমরা কাপুরুষ! শোনো, ঐ লোকটাকে আমাদের চাই। যেমন করে হোক, আমাদের দলে ওকে আনতে হবে।

একজন বললো— ওস্তাদ, তা কি করে সম্ভব?

সবই সম্ভব মানসিং, সবই সম্ভব। আমাদের দলে এমনি একটা লোকের নিতান্ত দরকার। ওকে বশীভূত করতে পারলে ওমন কত মতিচুর মালা আসবে আমাদের হাতের মুঠায়, বুঝলে?

এবার সবাই চুপ রইলো।

নর্তকীটা এগিয়ে এলো— ওস্তাদ, আমার পুরস্কার।

হাঁ পাবে। ওকে যদি আয়ত্তে আনতে পারো তাহলে লাখ রুপিয়া বখশীস পাবে। নাচো— নাচো এবার।

নর্তকী নাচতে শুরু করলো।

টেবিলের পাশের চেয়ারে ধপ করে বসে শরাবের বোতলটা তুলে নিয়ে মুখে চেপে ধরে ওস্তাদ।

এমন সময় একখানি গাড়ি এসে থামলো বার-এর সম্মুখে। কয়েকজন লোক নেমে এলো গাড়ি থেকে। প্রত্যেকের চেহারায় শয়তানের ছাপ বিদ্যমান।

বার-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে সবাই টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ওস্তাদ তখন গেলাসের পর গেলাস পান করে চলেছে। লোকগুলো টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেই বললো ওস্তাদ— মাল কোথায়?

লোকগুলো তখন যে যার পকেট থেকে নানারকম মানিব্যাগ, পুটলি, থলি, দুল, টাকা টেবিলে বের করে রাখতে লাগলো।

ওস্তাদ সবগুলো জড়ো করে টেনে নিলো কাছে, বললো— এইসব সামান্য জিনিস.....যেমন সব নেংটি ইঁদুর তেমনি তোমাদের কাজ। শোন, মতিচুর মালা এনেছো?

পিছন থেকে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো একজন, বললো সে— ওস্তাদ, মতিচুর মালা বোমসিং-এর কাছে আছে।

সে কোথায়?

ওস্তাদ, সে এক্ষুণি আসবে।

অল্পক্ষণ পরই একজন লোক ঘরে প্রবেশ করলো, তার চেহারা একেবারে খাঁটি ভদ্রলোকের মত। পরনে স্যুট, মাথায় ক্যাপ। লোকটা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেই বললো— হ্যালো মোদন, কি করছো বন্ধু? একটা চেয়ার দখল করে নিয়ে বসে পড়লো সে।

ওস্তাদ মোদন বললো— বোমসিং, মতিচুর মালা এনেছো?

বোমসিং বোতল থেকে খানিকটা শরাব ঢেলে ঢক্‌ঢক্ করে পান করলো, তারপর বললো— এনেছি। কিন্তু আমাকে কত দেবে?

তোমাকে যা দেবো সে পরে হবে। এখন মালাটা কোথায় বের করো।

বোমসিং ঢেকুর তুলে বললো—মালা আছে! তবে আমার সঙ্গে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মোদন—তাহলে তুমি মতিচুর মালা সঙ্গে আছে বললে কেন?

মানে আমার উদরে আছে।

উদরে মানে?

আমার গোপন আস্তানায় আছে

তাহলে তুমিও মালা আনোনি?

না। কত দেবে বলো? যদি হিসাবে ঠিক হয় তাহলে পেয়ে যাবে।

তিন ভাগের একভাব পাবে।

না, আমাকে হাফ দিতে হবে। বলো দেবে কিনা?

মোদন মুহূর্ত বিলম্ব না করে বোমসিং-এর টাইসহ জামাটা এঁটে ধরলো— মতিচুর মালাটা কেন আনোনি?

বন্ধু, চটছো কেন? আহা ছেড়ে দাও, কাল ঠিক আনবো।

অন্যান্য দলবল বলে উঠলো— ওস্তাদ, আজ বোমসিংকে ছেড়ে দিন, কাল আনবে বলছে।

আচ্ছা দিলাম, কিন্তু কাল ক্ষমা করবো না।

আর যদি না আনি?

খুন করবো তোমাকে।

বোমসিং হেসে উঠলো— দেখা যাবে কেমন খুন করো।

কি বললে? মোদন ক্ষেপে উঠলো ভীষণভাবে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো লড়াই।

বোমসিং শক্তিশালী মাড়োয়ারী লোক, সে মোদনকে কাবু করে পালিয়ে গেলো।

তার দলবল তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

মোদন গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো— উল্লুক তোমরা, বোমসিংকে ধরতে পারলে না?

সর্দার, ওর হাতে পিস্তল ছিলো।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো মোদন— মরার এত ভয় তোমাদের? নেংটি ইঁদুর কোথাকার! তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। যেমন করে হোক, ঐ ওকে আমার চাই। একজন হয়ে তোমাদের পঞ্চাশ জনকে যে কাবু করে দিতে পারে।

মোদন যাকে নিয়ে কথাগুলো বলছে সে তখন গাড়ির মধ্যে ঢলে পড়ছে বারবার।

রহমান স্পীডে গাড়ি চালিয়ে চলেছে, ভেবে পাচ্ছে না সর্দার এমন কাজ করলো কেন আজ।

সোজা আস্তানায় এলো রহমান সর্দারকে নিয়ে। কারণ সে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলো না, সর্দারকে এমন অবস্থায় সে কোথায় নিয়ে যাবে।

রহমানের কাঁধে ভর দিয়ে বনহুর প্রবেশ করলো আস্তানায়, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো নূরী। বনহুরকে এই অবস্থায় দেখে প্রথমে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলো, তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো— একি দেখছি রহমান? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

রহমান কোনো জবাব দিতে পারলো না, নীরবে মাথা নিচু করে নিলো।

নূরী এসেছিলো উচ্ছ্বাসিত আনন্দ নিয়ে, কতদিন পর তার হুর ফিরে এসেছে আস্তানায়, খুশিতে ডগমগ সে! কিন্তু এসে যখন দেখলো বনহুর স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসেনি, যা সে কোনোদিন ভাবতে পারে না সেই অবস্থায় আজ সে প্রথম দেখলো তার বনহুরকে। বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে

গিয়েছিলো নূরী, কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি সে। তারপর ছুটে পালিয়ে গেলো নূরী নিজের কক্ষে।

রাগে-দুঃখে-অভিমানে নূরীর কান্না আসছিলো ভীষণভাবে। নিজের বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো নূরী।

রহমান বনহুরকে তার কক্ষে পৌঁছে দিলো।

বনহুর টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালো নিজের শয্যার পাশে। ধপ করে বসে পড়লো শয্যায়। তাকালো চারিদিকে, হয়তো নূরীর সন্ধান করলো সে। তারপর বললো— রহমান.....নূরী কোথায়.....গেলো?.....ওকে পাঠিয়ে.....দাও.....

রহমান ব্যথায় মুষড়ে পড়ছিলো, কারণ সে কোনোদিন সর্দারকে এ অবস্থায় দেখেনি। দু'চোখ ফেটে পানি আসছিলো তার, বললো— আচ্ছা, আমি নূরীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রহমান এগিয়ে চললো নূরীর কক্ষের দিকে, যদি ও সে জানে, নূরী এই মুহূর্তে কিছুতেই তাদের সর্দারকে ক্ষমা করবে না, কারণ নূরী শরাব কোনোদিন পছন্দ করে না।

রহমান অপরাধীর মত এসে দাঁড়ালো নূরীর কক্ষে।

নূরী তখন বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

রহমান ডাকলো—নূরী!

নূরীর কান্না থেমে গেলো মুহূর্তে, সোজা হয়ে বসে বললো— এখানে কেন এসেছো তুমি?

নূরী শোনো।

না, আমি তোমার কোনো কথাই শুনবো না রহমান। বেরিয়ে যাও, যাও বলছি।

নূরী, সব শোনো, তারপর রাগ করো।

না না, কিছুই আমি শুনতে চাই না। আমি ভাবতে পারিনি, আমার হুর কোনোদিন মদ স্পর্শ করতে পারে।

আমিও তোমার মতই অবাক হয়েছি নূরী! সব শোনো তারপর রাগ করো।

নূরী অধর দংশন করে বললো— রহমান, আমাকে ভুলাতে পারবে না। আমি তোমার চেয়ে অনেক চালাক, বুঝলে?

সর্দার তোমাকে খুঁজছেন নূরী। চলো, চলো নূরী?

না না, যাবো না। যাও। আমি মাতালকে দেখতে চাই না। নূরী রহমানকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

অগত্যা রহমান ফিরে এলো সর্দারের কামরায়।

বনহুর পদশব্দে চোখ তুলে তাকালো— নূরী এসেছো.....

রহমান নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে, কোনো জবাব সে দিলো না।

বনহুর বললো— এলো না.....বেশ.....আমি যাচ্ছি.....তুমি যাও রহমান... বনহুর উঠে নূরীর কক্ষের দিকে এগুলো।

রহমান চলে গেলো ওদিকে।

এগিয়ে এলো নাসরিন, স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে বললো— অমন মুখ ভার কেন তোমার!

চলো নাসরিন, সব বলছি।

কি হয়েছে? কোনো মন্দ খবর না তো?

না।

সর্দার ভাল আছে তো?

আছে।

না, তোমার আচরণ আমার কাছে খুব সচ্ছ মনে হচ্ছে না, কিছু একটা ঘটেছে।

রহমান নাসরিনসহ চলে গেলো তাদের বিশ্রামকক্ষের দিকে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো নূরীর বন্ধ দরজায় মৃদু ধাক্কা দিয়ে জড়িত কণ্ঠে ডাকলো— নূরী.....নূরী দরজা খোলো— —নূরী.....নূরী দরজা খোলো.....

নূরী নিজকে কঠিন করে রাখলো, কোনো কথা সে বললো না।

বনহুর আবার ডাকলো—দরজা.....খোলো নূরী....আমাকে মাফ করো.....নূরী.....মাফ করো.....

নূরী এবার দরজা না খুলে পারলো না।

দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো কয়েক হাত দূরে, অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো মেলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর টলতে টলতে প্রবেশ করলো, জড়িত কণ্ঠে বললো— নূরী আমাকে মাফ.....করে দাও.....আমি.....বনহুর নূরীকে ধরতে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে নূরী সরে দাঁড়িয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো— আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা, স্পর্শ করোনা বলছি.....

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর, জড়িত আঁখি দুটি টেনে তুলে তাকালো, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—নূরী!

না না, আমি তোমাকে দেখতে চাই না। বেরিয়ে যাও তুমি আমার কামরা থেকে।

নূরী....আমার বড্ড মাথা ঘুরছে.....আমি দাঁড়াতে পারছি না.....আমাকে তুমি.....ক্ষমা.....করো.....

যাও তুমি— যাও বলছি।

নূরী বনহুরকে একরকম জোর করেই ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তারপর ফিরে গেলো সে নিজ কামরায়। বিছানায় ধপ্ করে উবু হয়ে পড়ে গেলো, হাতখানা ঝুলে রইলো এক পাশে।

সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো বনহুর।

নূরী বনহুরকে যতই উপেক্ষা করে তাড়িয়ে দিক, সে কিছুতেই ঘুমাতে পারলো না। বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলো, তার মনের পর্দায় বারবার ভেসে উঠতে লাগলো বনহুরের মুখখানা। নিদ্রা ঢুলুঢুলু দুটি চোখ, এলোমেলো চুল, সুন্দর শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়। কানের কাছে প্রতিধ্বনি হচ্ছে বনহুরের জড়িত মায়াভরা কণ্ঠস্বর...— নূরী....আমাকে মাফ করে দাও.....আমার বড্ড মাথা ঘুরছে....আমি দাঁড়াতে পারছি না.....আমাকে তুমি.....ক্ষমা করো.....আমাকে তুমি ক্ষমা করো.....

নূরী পারলো না নিজকে স্থির রাখতে, সে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে পড়লো, দেখলো বিছানায় উবু হয়ে পড়ে আছে সে। হাতখানা ঝুলছে একপাশে। পায়ে বুট, গায়ে জামা পরা রয়েছে। মাথার নিচে কোনো বালিশ নেই।

নূরী সরে এলো, ধীর পদক্ষেপে বনহুরের বিছানার পাশে। অতি যত্নে ওর ঝুলে-পড়া হাতখানা তুলে রাখলো পাশে, আংগুল দিয়ে এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিয়ে ললাটে আস্তে করে একটা চুম্বন দিলো, দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো বনহুরের গন্ডের উপর। তারপর পায়ের কাছে এসে বসলো নূরী। পা থেকে জুতা খুলে রেখে পা দুখানার উপর মাথা রাখলো। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চললো নূরী।

ভোরে বনহুরের ঘুম ভাঙতেই পা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না, কিছু যেন ভারী অনুভব করলো সে নিজ পা দু'খানার উপর।

বনহুর তাড়াতাড়ি উঠে বসে অবাক হয়ে গেলো। নূরী তার পা দু'খানার উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। বনহুরের ধীরে ধীরে মনে পড়লো সব কথা। একটুকরা হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটে। আস্তে আস্তে নূরীর মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকলো বনহুর— নূরী....

নূরীর নিদ্রা ছুটে গেলো মুহূর্তে। সোজা হয়ে বসলো সে। বনহুরের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই নূরী গম্ভীর মুখে মাথাটা নিচু করে নিলো।

বনহুর হেসে ওর চিবুকটা তুলে ধরলো— নূরী, আমাকে মাফ করেছো তো?

নূরী উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর ওকে টেনে নিলো কাছে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো— নূরী, আমার ভুল হয়েছে।

অভিমানভরা কণ্ঠে বললো নূরী— হুর, আমি ভাবতে পারিনি তুমি শরাব পান করা শিখেছো। তুমি.....মাতাল.....

নূরী, আমাকে ভুল বুঝো না, সত্যি বিশ্বাস করো, আমি মাতাল নই।

তুমি কাল শরাব পান করোনি?

হাঁ, করেছিলাম.....

এ অভ্যাস তোমার হলো কবে থেকে বলো?

জীবনে এই বুঝি প্রথম, তবে হঠাৎ কোনো সময় ভুল করে.....

ভুল— অমন ভুল তোমার এখন প্রায়ই হবে। একবার যে মদ গলধঃকরণ করে সে নাকি কোনোদিন এই নেশা ত্যাগ করতে পারে না।

নূরী, জীবনরক্ষার জন্য কাল শরাব পান করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি কালচক্রের প্যাঁচে আটকা পড়েছিলাম। তুমি বিশ্বাস করো নূরী, তাই.....

কিন্তু আবার যদি কোনোদিন ঐ জিনিস স্পর্শ করো।

তুমি যা খুশি শাস্তি আমাকে দিও।

বলো, আর ওসব খাবে না কোনোদিন?

বললাম, খাবো না।

বনহুরের বুকে মাথা রাখে নূরী।

❑

ওস্তাদ, সেদিন থেকে ঐ লোকটাকে অনেক খুঁজেছি কিন্তু কোথাও তার টিকিটা দেখিনি। আমাদের এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে ওরা দু'জন যে কোথায় গুম হলো! মানসিং কথাগুলো বলে থামলো।

মোদন চোখ দুটো গোলাকার করে বললো— আমাকে জিজ্ঞাসা করছো ওরা কোথায় গুম হলো?

না ওস্তাদ, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না, বলছি আশ্চর্য বটে। কান্দাই শহর তন্নতন্ন করে সন্ধান করেছি তবু ওদের সন্ধান পাইনি। মানসিং থামলো এবার।

মোদন হুঙ্কার ছাড়লো— আমাদের ব্যবসা আরও জোরদার করতে হবে। কাজেই শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন, ওকে যে নেশা আমি সেদিন খাইয়ে দিয়েছি, কোনোদিন সে ও নেশা ছাড়তে পারবে না। নিশ্চয়ই সে আসবে।

হরিলাল নামক অনুচরটি বলে উঠে— ওস্তাদ, আমারও তাই মনে হচ্ছে, বেটা না এসেই পারবে না। শুধু আপনার ওষুধের নেশা নয় ওস্তাদ, ডালিয়ার রূপসুধা সে পান করেছে.....

কই আর ডালিয়ার রূপসুধা পান করলো? সে তো শুধু হাত পাকড়েছিলো। বেটা রঘুনাথ সব মাটি করে দিয়েছিলো সেদিন। হাঁ, আর একবার এলে হয়!

আসবে— আসবে— হাঁ, তোমরা শোনো, যে তাকে আমার নিকটে পৌঁছে দিতে পারবে তাকে আমি বিশটা মোহর দেবো।

মোহর দেবেন ওস্তাদ! বিশটা?

হাঁ, বিশটা স্বর্ণমোহর.....হাঃ হাঃ হাঃ.....

নর্তকী পাশেই ছিলো, সে বললো— অতোগুলো মোহর আপনি নষ্ট করবেন ওস্তাদ?

নষ্ট নয় ডালিয়া, নষ্ট নয়। হীরা নিতে কাঁচ নষ্ট, বুঝলে? ওকে যদি বশীভূত করতে পারি তাহলে আমার বরাৎ ফিরে যাবে। সমস্ত কান্দাই শহর আমি হাতের মুঠায় নিয়ে নেবো। হাঃ হাঃ হাঃ.... হাঃ হাঃ হাঃ...

ওস্তাদ, মতিচুর মালাতো এখনও আপনার আয়ত্তে এলো না? ভুল করে আপনি সেদিন ওটা বোমসিং-এর কাছে পাঠিয়ে হাতছাড়া করেছিলেন?

না মানসিং, আমি ভুল করিনি। সেদিন মতিচুর মালা আমার এখানে থাকলে পুলিশ নিশ্চয়ই ওটা পেতো এবং আমাকে আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হতো। জানোতো মতিচুর মালা লাভের জন্য আমাকে কতগুলো খুন করতে হয়েছে?

জানি ওস্তাদ। আমরাই যে আপনার সাহায্যকারী।

মানসিং, তুমি আজই বোমসিং-এর কাছে যাও, যেমন করে পারো ওকে হত্যা করে মতিচুর মালা নিয়ে এসো। বন্ধুত্বের উপযুক্ত সাজা দেবো আমি ওকে.....

কথা শেষ হয় না মোদন ওস্তাদের, বোমসিং বিরাট দেহ নিয়ে বার-গৃহে প্রবেশ করে, বলে সে—বন্ধুত্বের উপযুক্ত সাজা দিতে হবে না মোদন, মালা আমি নিয়ে এসেছি.....

কক্ষমধ্যে সবাই তাকালে বোমসিং-এর দিকে।

মোদন বললো—এসেছো তাহলে?

বললো বোমসিং— না এসে কি পারি? আমার যে কথা সেই কাজ। তবে মালা যদি চাও, এক শর্তে দেবো বা দিতে পারি।

বলো?

এ মালা পেতে তোমাকেও যেমন পরিশ্রম করতে হয়েছে, তেমনি হয়েছে আমাকে। এ মালার মূল্য দুই লাখ টাকা! তুমি আমাকে এক লাখ দাও, আমি তোমাকে মালাটা বিনা দ্বিধায় দিয়ে দেবো।

এই কথা! তা এতদিন বলোনি কেন? হাফ্ হাফ্ রাজি। তুমি বলেছিলে তিন ভাগ নেবে, তাই তো আমি ক্ষেপেছিলাম বন্ধু। বেশ, মালা বের করো?

আগে তুমি টাকা আনো?

আচ্ছা, তাই আনছি। এত অবিশ্বাস বন্ধু আমাকে?

না না, অবিশ্বাস নয়, এটা নীতি.....

থাম, আর বেশি বকতে হবে না। চলো, গোপনকক্ষে চলো, টাকা সেখানেই পাবে।

দেখো মো....ন, শেষে মনটা কালো করোনা।

মানে?

মানে কোনোরকম চালাকি করতে যেও না।

না না, কোনোরকম চালাকি করবো না বন্ধু। এক লাখ টাকা তোমাকে গুণে দিয়ে মালাটা গ্রহণ করবো।

মোদন আর বোমসিং বার-গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। অন্যান্য অনুচর তাদের দু'জনাকে অনুসরণ করলো।

বার-গৃহের একটি গোপনকক্ষে গোলাকার টেবিলের পাশে সবাই গোল হয়ে চারদিক ঘিরে বসলো।

বোমসিং-এর অলক্ষ্যে মোদন পকেটে স্প্রিংওয়ালা ছোরাখানা গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলো। বোমসিং যখন টাকা গুণে নিতে যাবে তখন পেছন থেকে তার পিঠে ছোরা বসিয়ে দেওয়া হবে।

মানসিং রঘুলাল এবং মোদনের দলবল সবাই গোল টেবিলটা ঘিরে দাঁড়ালো।

মোদন আসন গ্রহণ করে বললো—বসো বন্ধু!

বোমসিং বসলো।

মোদন নিজে টেবিলের ড্রয়ার খুলে গাদা গাদা টাকার ফাইল বের করে টেবিলে রাখলো। বললো সে— বোম, মালা বের করো এবং টাকা গুণে দাও।

অত টাকা দেখে বোম সিং- এর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে খুলে ফেললো। ঝকমক করে উঠলো মালাটা বার-গৃহের উজ্জ্বল আলোকছটায়। অপূর্ব অদ্ভুত মূল্যবান মতিচুর মালা।

সবাই বিস্ময় নিয়ে তাকালো মালাটার দিকে।

মোদন বললো—দাও বন্ধু, আমার হাতে দাও। টাকাগুলো এবার গুণে নাও.....হাত পাতলো মোদন।

বোমসিং মালাখানা মোদনের হাতে দিয়ে টাকার ফাইলগুলো টেনে নিতে গেলো কাছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মোদন বাম হাতে মালা ধরে ডান হাতে ছোরাখানা মেলে বোম সিং-এর পিঠে বিদ্ধ করতে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে জমকালো পোষাক পরা কে যেন এসে দাঁড়ালো তাদের পিছনে যমদূতের মত। গম্ভীর চাপা স্বরে বললো—খবরদার, ছোরা নামিয়ে নাও।

সবাই এক সঙ্গে ফিরে তাকালো।

বোম সিং চমকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো, দেখলো মোদনের হাতে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা উদ্যত তারই পিঠের কাছে। তার দৃষ্টিও গিয়ে পড়লো জমকালো মূর্তিটার দিকে এবার।

গোলাকার টেবিলের পাশে সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তির দিকে।

মোদনের বাম হাতে মতিচুর মালা আর ডান হাতে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা, চোখেমুখে ভয়-ভীতি আর বিস্ময়। সে দেখলো, জমকালো মূর্তির দক্ষিণ হস্তে জমকালো একটা রিভলভার। ফ্যাকাশে হলো মোদনের মুখ, ঢোক গিলে বললো— কে তুমি?

জমকাল্লো মূর্তি হস্তস্থিত রিভলভার সম্মুখে উদ্যত রেখে বললো—দস্যু বনহুর!

মুহূর্তে কক্ষমধ্যের সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেলো, ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো সকলের মুখমন্ডল।

মোদন ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বললো— দস্যু বনহুর! তুমি .....তুমি জীবিত আছো?

হাঁ, আমি তোমাদের জান নেবার জন্য আজও জীবিত আছি একটুও নড়তে চেষ্টা করোনা, সবাই যার-যার অস্ত্র ফেলে দাও। মোদন, তুমি ছোরা ফেলে দাও.....

দস্যু বনহুরের রুদ্রমূর্তি দর্শন করে সকলের হৃৎপিন্ড ভয়ে স্তব্ধ গিয়েছিলো যেন। সবাই অস্ত্র নিক্ষেপ করলো এক এক করে। মোদন হস্তহিত ছোরাখানা ফেলে দিলো মেঝেতে। তাকালো সে দস্যু বনহুরের মুখোসপরা মুখ খানার দিকে। সে ভাবতেও পারেনি, তখন আচম্বিতে দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটবে।

কেউ নড়বার সাহস পেলো না, কারণ জমকালো দস্যুহস্তে জমকালো মরণ-অস্ত্র উদ্যত রয়েছে। যে নড়বে সেই মরবে তাতে কোনো ভুল নেই।

মোদনকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর— মালাছড়া আমার দিকে ছুঁড়ে দাও মোদন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের মাথাটা দোলালো সে একটু।

মোদনের কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মতিচুর মালার জন্য সে বহু লোকের জীবননাশ করেছে, এমন কি আজও সে হত্যা করতে যাচ্ছিলো তার পার্টনার বোমসিংকে।

মোদনকে ভাবতে দেখে হুঙ্কার ছাড়লো বনহুর— বিলম্ব করছো কেন? মরতে চাও নাকি?

মোদন অসহায়ভাবে তাকালো বোমসিং- এর মুখের দিকে। একটু পূর্বে যাকে খুন করতে যাচ্ছিলো সেই বোমসিংকে পরম বন্ধু বলে মনে হলো এক্ষণে। কিন্তু কোনো উপায় নেই, মালা তাকে দিতেই হবে, কারণ তারা জানে দস্যু বনহুর কতখানি ভয়ঙ্কর!

মোদন মতিচুর মালাছড়া ছুঁড়ে ফেলে দিলো বনহুরের দিকে।

বনহুর বাম হস্তে লুফে নিলো মালাছড়া।

এবার বনহুর বোমসিংকে লক্ষ্য করে বললো— টাকার বান্ডিলগুলো ছুঁড়ে দাও। এক-একটা করে দাও.....

বোমসিং দস্যু বনহুরের আদেশ পালন করলো। সে একটা একটা করে দশটা বান্ডিল ছুঁড়ে দিলো বনহুরের দিকে।

বনহুর এক-একটা নিয়ে পকেটে রাখলো।

দশটা বান্ডিলে ছিলো এক লাখ টাকা।

বনহুর মালা এবং টাকার বান্ডিলগুলো নিয়ে হঠাৎ যেমন ধুমকেতুর মত কক্ষমধ্যে আবির্ভাব হয়েছিলো তেমনি অকস্মাৎ উধাও হলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই হুঁশ হলো সকলের।

মোদন প্রাণফাটা চিৎকার করে উঠলো— গ্রেফতার করো...দস্যু বনহুর...দস্যু বনহুর...

মোদনের অনুচরগণ ছুটলো এদিকে সেদিকে।

ততক্ষণে বার-গৃহে একটা মহা হুলস্থুল পড়ে গেছে, মোদন ছুটে গিয়ে ফোন করলো— হ্যালো, হ্যালো ইন্সপেক্টার, আপনি এক্ষুণি চলে আসুন পুলিশ-ফোর্স নিয়ে, দস্যু বনহুর আমার বারে হানা দিয়ে আমাকে সর্বস্বান্ত করে সব নিয়ে গেছে আমাকে সর্বস্বান্ত করে সব নিয়ে গেছে ইন্সপেক্টার... আপনি চলে আসুন.....

ওদিকে পুলিশ অফিসে সাড়া পড়ে যায়।

ইন্সপেক্টার ইয়াসিন আহমদ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন— দস্যু বনহুর? বলেন কি!

হাঁ, দস্যু বনহুর এইমাত্র আমার বার-এ এসেছিলো। আপনি দয়া করে শীঘ্র চলে আসুন.....হ্যালো, হ্যালো ইন্সপেক্টার, চলে আসুন.....

ইন্সপেক্টার ইয়াসিন আহমদ তাঁর সহকারী এবং পুলিশ অফিসারগণকে বললেন—'মোদন মোহন বার'-এ দস্যু বনহুর হানা দিয়ে সব লুটে নিয়ে গেছে। আপনারা পুলিশ ফোর্সসহ প্রস্তুত হয়ে নিন। এক্ষুণি যেতে হবে।

কান্দাই পুলিশ ডায়রীতে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অনেক কিছু উল্লেখ আছে, কিন্তু বেশ কিছুদিন হলো কান্দাই শহর নীরব ছিলো। দস্যু বনহুরের উপদ্রব ছিলো না বললেই চলে, হঠাৎ পুলিশ অফিসের লোকজন এবং অফিসারগণ উদ্বিগ্ন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

অল্পক্ষণেই পুলিশ বাহিনী নিয়ে ইন্সপেক্টার ইয়াসিন আহমদ হাজির হলেন 'মোদন মোহন বার'-এ।

কিন্তু তখন দস্যু বনহুর কোথায়।

পুলিশ ইন্সপেক্টার ইন্‌কোয়ারী করে কোনো ক্লু আবিষ্কারে সক্ষম হলেন না। তিনি সব দেখেশুনে ডায়রী করে ফিরে এলেন পুলিশ অফিসে।

পরদিন।

কান্দাই পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো—

"কান্দাই শহরে পুনরায় দস্যু বনহুরের আবির্ভাব। মোদন মোহন বার থেকে লক্ষ টাকা এবং মূল্যবান কোনো এক সামগ্রী নিয়ে দস্যু বনহুর উধাও হয়েছে। কান্দাই পুলিশ দস্যুকে গ্রেফতার করতে গিয়ে বিফল হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি—"

পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে মোদন পায়চারী করছে তার বার-গৃহের অভ্যন্তরে একটি কক্ষের মেঝেতে। তার চারপাশে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে মোদনের সহচর দল।

মোদন পত্রিকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলছে— দস্যু বনহুর আমার এতবড় সর্বনাশ করলো! আমি তাকে উপযুক্ত সাজা না দিয়ে ছাড়বো না। মানসিং, দস্যু বনহুরকে কাবু করতে পারে সে ঐ লোক, যে তোমাদের মত শক্তিশালী বিশজনকে পট্‌কান দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে গেলো।

হাঁ ওস্তাদ, লোকটা অসীম শক্তির অধিকারী। কোনোক্রমে ওকে পেলে আমাদের কাজ অনেক হালকা হবে। মানসিং কথাটা বলে থামলো।

মোদন বললো— তোমাদের যে কেউ তাকে আমার নিকট এনে দিতে পারবে তাকে আমি বিশখানা মোহর দেবো বলেছি, আবার আমি কথা দিলাম।

উপস্থিত সকলের মুখেই একটা লোভাতুর ভাব ফুটে উঠলো। সবাই চায় তাকে খুঁজে আনতে। সেদিনের ঘোষণার পর থেকে এরা ওকে রীতিমত সন্ধান করে চলেছে— পথেঘাটে, যানবাহনের মধ্যে, হোটেল-ক্লাবে, ষ্টেশনে, এরোড্রোমে সব জায়গাতেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওকে তারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি।

আজ আবার মোদন মোহনের কথায় সবাই সজাগ হয়ে উঠলো নব উদ্যমে। বিশটা স্বর্ণমোহর কম কথা নয়।

বার-এর অভ্যন্তরে যখন মোদন আর তার দলবল এসব আলোচনায় মত্ত তখন বার-গৃহে প্রবেশ করে বনহুর। আজ তাঁর দেহে পূর্ব দিনের সেই ড্রেস।

বনহুরকে দেখামাত্র কয়েকজন ছুটে এলো, যারা সেদিন তাকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করেছিলো।

মোদন নিজে পত্রিকাখানা হাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো বনহুরের সম্মুখে— আরে বন্ধু, তুমি এসে গেছো?

বনহুর কারো বলবার অপেক্ষা না করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে। মোদনও বসে পড়লো তার পাশের চেয়ারে মুখখানা বনহুরের দিকে ফিরিয়ে।

অন্যান্য দলবল সবাই উদগ্রীবভাবে দাঁড়িয়ে রইলো টেবিলের চারপাশে।

মোদনের চোখেমুখে আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে, বিশখানা স্বর্ণ মোহরের বিনিময়ে যাকে সে কামনা করেছিলো এই মুহূর্তে তাকে বিনা দ্বিধায় পেয়ে গেলো। মোদনের কাছে এ যে অমূল্য সম্পদ।

মোদন ওকে দেখামাত্র খুশির উচ্ছাসে ভরপুর হয়ে উঠেছে, তৎক্ষণাৎ নানারকম ফলমূল, মাংস আর মূল্যবান শরাবের অর্ডার দিলো।

বনহুর স্থিরকণ্ঠে বললো— সেদিন তোমার এখানে যা খেয়েছিলাম তার বিল না দিয়েই আমি চলে গিয়েছিলাম, তাই বিল দিতে এসেছি।

মোদন হেসে উঠলো হো হো করে, বনহুরের পিঠে মৃদু আঘাত করে— আরে বন্ধু, ওসব কিছু লাগবে না। তুমি যত খুশি খেতে পারো।

বনহুর ভ্রু কুঁচকে বললো— তা হয় না। বিনা পয়সায় খেয়ে আমি তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারি না। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বনহুর।

মোদন বনহুরের হাত থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে পুনঃ বনহুরের পকেটে রেখে দিয়ে বলে— যত খুশি খাও।

ততক্ষণে বয় টেবিলে নানারকম ফলমূল আর বিলেতী মদের বোতল সাজিয়ে রাখলো।

মোদন ফলমূলের ট্রেখানা এগিয়ে দিলো বনহুরের দিকে— খাও বন্ধু।

অন্যান্য অনুচরও যে যা পারছে এগিয়ে দিচ্ছে বনহুরের সম্মুখে। কেউ বা আপেল কেটে বাড়িয়ে ধরছে ওর মুখের কাছে। কেউ বা কাঁটা দিয়ে মাংস তুলে গুঁজে দিচ্ছে ওর মুখ-গহ্বরে।

বনহুর মনে মনে হাসছে, আর খাবারগুলো পরম আনন্দে খাচ্ছে। সবাই যেন বনহুরকে খুশি করবার জন্য মেতে উঠেছে। একজনের ইংগিতে যে

এসব হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর লক্ষ্য করছে, এদের সত্যি কারের পরিচালক কে—মোদন না বোমসিং।

আজ আসরে বোমসিং নেই।

মোদনের ইংগিতে নর্তকী কস্তরী বাঈ এসে হাজির হলো বনহুরের সম্মুখে।

সরে দাঁড়ালো সবাই একপাশে।

বনহুর অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নতুন নর্তকীটার দিকে। নর্তকীর সমস্ত দেহ কালো আবরণে ঢাকা। মুখের অর্ধেকটাও ঢাকা রয়েছে।

মোদনের ইংগিতে নর্তকীটা এসে দাঁড়ালো।

মোদন আদেশ করলো—শরাব ঢালো।

নর্তকীটা শরাব ঢাললো কাঁচপাত্রে।

বললো মোদন নাচো— নাচো এবার।

নর্তকী নাচেতে শুরু করলো।

বনহুর খেতে খেতে তাকাচ্ছিলো নর্তকীর দিকে।

মোদন এবং তার দলবল হাতে তালি দিয়ে নর্তকীকে উৎসাহ দান করে চললো।

বনহুর ফলমূল বেশি ভালবাসে তাই সে ফলমূল খেতে লাগলো আপন মনে।

মোদন একসময় বললো— তোমার সঙ্গীকে আজ দেখছিনা কেন বন্ধু?

বনহুর ফল চিবুতে চিবুতে নর্তকীর দিকে দৃষ্টি রেখে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলো— তার কাজে সে সরে পড়েছে।

মোদন বনহুরের ভাব লক্ষ্য করছিলো, সে বুঝতে পারছিলো, নর্তকীর নাচ তাকে অভিভূত করেছে। একটা আশার আলো দেখা দিলো শয়তান মোদনের মনে। সেদিনের চেয়ে আজ ওকে বেশি আনন্দমুখর দেখাচ্ছে। মোদন একসময় শরাবের গেলাসটা এগিয়ে ধরলো বনহুরের সামনে।

বনহুর গেলাসটা হাতে নিয়ে টেবিলে রাখলো।

মোদন বললো—তোমার নাম কি বন্ধু? তোমার নামটা আজও জানতে পারিনি।

আফসোস, নামটা আমারই মনে নেই। আচ্ছা, কাল আমার বন্ধুর কাছে জেনে আসবো। আবার অন্যমনস্ক হবার ভান করে বনহুর।

মোদন ভিতরে ভিতরে খুশি হয়, এমন আপনভোলা মানুষ সে তো কোনোদিন দেখেনি। এমনি লোকেরই দরকার— যে অদ্ভুত শক্তি রাখে, দেখতেও অপূর্ব সুন্দর, কাজেও হবে ক্ষমতাবান কিন্তু মনে রাখেবে না কিছু। ওকে দিয়ে যা খুশি করানো যাবে।

বললো মোদন—তোমাকে ভোলাসিং বলে ডাকবো, বুঝলে?

বেশ বেশ, ভোলা নামটাই আমার বেশি পছন্দ।

আচ্ছা ভোলাসিং?

বলো বন্ধু?

তুমি আমাদের দলে এসে যাও না কেন?

সে কি রকম?

মানে আমাদের বার-এ কাজ করবে। মোটা টাকা মাহিনা পাবে।

উঁ মোটা মাহিনা দেবে?

হাঁ।

কত দেবে আমাকে?

যত চাও। দু'শো, চার শো, হাজার, যত চাবে ততই পাবে।

এ্যাঁ, কি বললে বন্ধু? দু শো— চার শো— হাজার— বলো কি সত্যিই এত টাকা মাইনে দেবে আমাকে?

হাঁ, আজ থেকে তুমি আমাদের দলের লোক হলে, বুঝলে? মাইনে পাবে মাসে এক হাজার।

এক হা—জা—র?

হাঁ।

বেশ, কি কাজ করতে হবে, বলো বন্ধু?

এবার মোদন তার সম্মুখে পত্রিকাখানা মেলে ধরলো; বললো পড়ে দেখো— কান্দাই শহরে দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাব।

অস্ফুট ভীতস্বরে বলে উঠলো বনহুর—কান্দাই শহরে দস্যু বনহুর.....

ভয় পাবার কিছু নেই বন্ধু।

সর্বনাশ, দস্যু বনহুর কান্দাই শহরে আগমন করেছে আর তোমরা বলছো ভয় নেই?

তোমার শক্তির কাছে দস্যু বনহুর কোন্ ছার। একমাত্র দস্যু বনহুরকে তুমিই পারবে কাবু করতে। পত্রিকায় খবরটা পড়ে দেখো, সে আমার সর্বনাশ করেছে।

পড়েছি তোমার এক লাখ টাকা আর কোনো একটা মূল্যবান জিনিস নিয়ে ভেগেছে.....

মূল্যবান জিনিসটা কি জানো না বন্ধু, সেটা বহু টাকা মূল্যের মতিচুর মালা.....

এাঁ, বলো কি— মতিচুর মালা?

হাঁ, ।

সে কেমন দেখতে?

দস্যু বনহুরকে যদি কাবু করতে পারো তাহলে ঐ মতিচুর মালা তোমাকে দেখাবো, আর পেলে তুমি দশ হাজার টাকা। জীবনে তোমাকে আর পেটের জন্য ভাবতে হবে না বন্ধু?

সত্যি!

সত্যি বলছি। নাও শরাব পান করো।

শরাব আমি পান করিনা বন্ধু।

এখানে কাজ করতে হলে শরাব তোমাকে খেতে হবে। মোদন শরাব ভর্তি গেলাসটা এগিয়ে ধরলো বনহুরের দিকে।

বনহুর গেলাসটা অগত্যা হাতে নিলো, শরাবের উগ্রগন্ধ তার নাকে প্রবেশ করছে। মনে পড়ছে নূরীর মুখখানা, সেই অশ্রুভরা দুটি আঁখি, সেই রাগতঃ কণ্ঠস্বর শরাব পান সে করবে না আর।

বনহুর শরাবের গেলাস হাতে তাকায় টেবিলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলোর মুখে, যেন এক-একটা জীবন্ত শয়তান। ওরা সবাই শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার হাতের শরাব-পাত্রটার দিকে।

বনহুর ভেবেছিলো মোদনের দৃষ্টি এগিয়ে একসময় হাতের পাত্র থেকে শরাব ফেলে দেবে টেবিলের কোণে এক বাসনের মধ্যে। কিন্তু এতগুলো

চোখের দৃষ্টি তার হাতের পাত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে অগত্যা শরাব পান করতে হলো আজও বনহুরকে কতকটা বাধ্য হয়ে।

শরাব পান করে বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

মোদন বললো— চলো তোমাকে আমাদের আসল আস্তানাটা দেখিয়ে দেই।

বনহুর বললো— চলো।

মোদন এবং তার সঙ্গিগণ বনহুরকে সঙ্গে নিয়ে বার এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। গুপ্ত একটা কক্ষমধ্যে এসে দাঁড়ালো ওরা বনহুরকে নিয়ে।

মোদন সবার আগে দাঁড়িয়ে, পাশে বনহুর।

পিছনে মোদনের অন্যান্য অনুচর।

মোদন দেয়ালে একটা বোতামে চাপ দিতেই দেয়াল ফাঁক হয়ে একটা পথ বেরিয়ে এলো।

মোদন বনহুরকে নিয়ে সেই পথে অগ্রসর হলো। অবাক হয়ে দেখলো বনহুর একটা বিরাট কক্ষে এসে তারা দাঁড়িয়েছে। কক্ষটা আধো অন্ধকার, কক্ষমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠলো। কতকগুলো কঙ্কালের মত জীন মানুষকে সেই কক্ষে শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সহসা দেখলে বোঝা মুস্কিল ওরা জীবিত না মৃত।

মোদন বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো— এই যে দেখছো এরা সবাই কান্দাইবাসী নয়। কেউ কান্দাই শহরের, কেউ কান্দাই এর বাইরের, কেউ আরও দূরের। এদের সবাইকে বন্দী করে রাখা হয়েছে কারণ এদের জন্য আমরা মোটা টাকা দাবী করে চিঠি লিখেছি এদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে। যারা ঐ টাকার দাবী পূরণ করবে তারাই মুক্তি পাবে আর যারা ঐ টাকা দিতে অক্ষম হবে, তাদের মুক্তি নেই। এখানে তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে এরা.....

বনহুর অবাক হয়ে দেখছিলো আর শুনছিলো মোদনের কথাগুলো। ভিতরে ভিতরে রাগে ক্রুদ্ধ সিংহের মত ফুলছিলো বনহুর, দক্ষিণ হস্তখানা মুষ্ঠিবদ্ধ হচ্ছিলো। কিন্তু শরাব পানের নেশায় ঢুলুঢুলু করছে ওর দেহটি তখন।

মোদন সেই বন্দীশালা অতিক্রম করে বনহুরসহ একটি কক্ষ্যমধ্যে এসে দাঁড়ালো। কক্ষটা জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

মোদন একটা সুইচ টিপতেই অদ্ভুত শব্দ হলো ঘড়—ঘড়—ঘড়—তারপর একটা আওয়াজ হলো— ঠিক পাতালপুরী থেকে কেউ যেন কথা বলছে, কিংবা কোনো ফাঁকা হলঘর থেকে আওয়াজ করছে।...কি খবর মোদন.....তোমার সঙ্গে কে ওটা.....কি চায় সে.....বলো?

বনহুর অবাক হয়ে চারিদিকে তাকালো, কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে, কিন্তু এত স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। কেউ যেন সেই কক্ষে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

বনহুরকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে বললো মোদন— চুপ করে শোনো, কথা বলোনা যেন ভোলা।

বনহুর মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো, সে কথা বলবে না।

মোদন বললো— মালিক, খবর ভাল। আমি একজন লোককে সঙ্গে এনেছি, সে অত্যন্ত শক্তিশালী লোক। একাই বিশ জনকে কাবু করতে পারে। ওকে আমরা কাজে বহাল করে নেবো কিনা, তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি।

আবার সেই শব্দ, যেন কেউ সামনে দাঁড়িয়ে বললো.....

.....কাজে বহাল করে নেবার পূর্বে ওকে পরীক্ষা করে নেবে। কারণ বাইরের লোককে বিশ্বাস নেই।

মোদন বললো—আচ্ছা মালিক।

পুনরায় সেই গুরুগম্ভীর আওয়াজ.....যাও কিন্তু.....হুশিয়ার মোদন....

মোদন বললো আবার- হুঁশিয়ার মালিক।

এবার বনহুরকে নিয়ে বেরিয়ে এলো মোদন।

লৌহশিকলে আবদ্ধ অসহায় লোকগুলোর কথা দস্যু বনহুরকে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত করে তুললো। আরও একটা বিষয় তাকে ভাবিয়ে তুললো সে হলো, মোদন এই শয়তান দলের শিরমণি নেতা নয়, আরও একজন আছে যার ইংগিতে এরা পুতুলের মত কাজ করে চলেছে। কিন্তু কে সে আর কোথা হতেই বা সে এদের পরিচালনা করে চলেছে।

বনহুরকে ভাবতে দেখে বলে মোদন—এসো, তোমাকে আমরা কাজে বহাল করে নেবো, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই।

বনহুর খুশি হবার ভান করে বললো—আচ্ছা বন্ধু।

গভীর রাতে ফিরে এলো বনহুর আস্তানায়, তখন তার নেশায় ঢুলুঢুলু অবস্থা। চুপি চুপি নিজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো, যেন নূরী টের না পায় তেমনিভাবে শয্যা গ্রহণ করলো বনহুর।

আড়ালে লুকিয়ে নূরী সব দেখলো, রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করলো। মনে মনে সে একটা পরামর্শ আঁটলো- গোপনে ফলো করবে বনহুরকে— কোথায় যায় আর কে তাকে শরাব পানে মত্ত করে, দেখবে সে আপন চোখে।

কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে নূরী।

বনহুর একসময় নূরীর সন্ধানে বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে।

টলতে টলতে এগিয়ে চললো সে নূরীর কক্ষের দিকে। দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো, দরজায় মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকলো— নূরী— নূরী দরজা খোলো,—দরজা খোলো— নূরী.....

কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়া এলো না।

অনেক কেঁদেছে নূরী, তাই সে ক্লান্তি আর অবসাদে গভীর অচেতন হয়ে পড়েছে। বনহুরের কণ্ঠ তার নিদ্রাভংগ করতে পারে না।

সোজা বেরিয়ে আসে বনহুর আস্তানা থেকে।

তাজের পিঠে চেপে বসে বনহুর; তাজ প্রভুকে পিঠে পেয়ে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করে।

❑

মনিরা তাদের নতুন বাড়ি তালাবন্ধ করে চলে এসেছে চৌধুরীবাড়িতে। মরিয়ম বেগম নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে মনিরা আর নূরীকে।

মনিরা বসে বসে নূরের জামা সেলাই করছিলো।

বয় এসে পাশের ত্রি-পয়ার উপরে দৈনিক পত্রিকাখানা রেখে গেলো।

মনিরার দৃষ্টি পড়লো পত্রিকার উপরে বড় বড় অক্ষরগুলোতে। সেলাই রেখে পত্রিকাখানা তুলে নিলো হাতে, বিস্ময় ভরা নয়নে পড়তে লাগলো—

কান্দাই শহরের বুকে পুনরায় দস্যু বনহুরের আবির্ভাব। শহরে ভীষণ আতঙ্কের অবস্থা। ইত্যাদি—

মনিরা একবার নয়, বারবার পড়তে লাগলো। দস্যু বনহুর তাহলে নীলা দ্বীপ থেকে ফিরে এসেছে। আনন্দে দু'চোখে তার পানি এলো।

খোদার কাছে শুকরিয়া করলো সে দু'হাত তুলে। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ তার শুকিয়ে গেলো—পুলিশ তাকে পাকড়াও করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, যে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করে দিতে পারবে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সরকার পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করেছেন। না জানি তার স্বামীর জন্য কত গুপ্তচর ছড়িয়ে পড়েছে কান্দাই শহরের আনাচে কানাচে। কত লোক এই টাকার লোভে সন্ধান করে ফিরছে তাকে, কে জানে!

মনিরার মনে একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে, পত্রিকা হাতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মনিরা।

এমন সময় নূর এসে পড়ে সেখানে।

মনিরা পত্রিকাখানা তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে জামাটা তুলে নিলো হাতে।

নূর মায়ের পাশে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, বললো—আম্মি, জামা সেলাই হয়েছে তোমার?

মনিরা আঁচলে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললো—হয়েছে বাবা এসো পরিয়ে দেই।

মনিরা পুত্রদেহে জামাটা পরিয়ে দিতে দিতে বললো—নূর, তোমার আব্বুর জন্য মন কেমন করছে, না?

হাঁ, সব সময় আব্বুর কথা মনে পড়ছে। আচ্ছা আম্মি, আব্বু সেদিন চলে গেলো, আর এলো না কেন? বলো কবে আসবে?

জানি না।

আব্বুর কথা বললেই তুমি কেমন যেন আনমনা হয়ে যাও। বলোনা আম্মি, আব্বু কোথায় যায় এমন করে?

বললাম তো জানি না? যাও, স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে।

মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ শোনা যায়—নূর, সরকার দাদু এসেছেন, তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। শীগগীর এসো।

নূর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বেরিয়ে গেলো, যেতে যেতে উচ্চকণ্ঠে বললো—আসছি দাদী আম্মা.....

মনিরা আবার স্বামীর চিন্তায় ডুবে যায়।

সমস্ত দিনটা মনিরার ছটফট করে কাটে। কান্দাই ফিরে এসে আজও এলো না সে তার কাছে। কেন এলো না? দস্যুতাই কি তার জীবনের

সবচেয়ে বড় ব্রত? মা, সন্তান, স্ত্রী এরা কি কিছু নয়! এতই হৃদয়হীন সে.....

রাত বেড়ে আসছে, মন তার হাঁপিয়ে উঠছে— আজও কেন এলো না সে। নূর দাদীমার ঘরে শোয়, এ ঘরে মনিরা একা থাকে।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে মনিরা, মনে পড়ে পত্রিকাখানার কথা। বালিশের নিচে হাত দিতেই মনে হয়, সে তো সকালে ওঘরে বসে সেলাই করছিলো, পত্রিকাখানা নূরের বালিশের তলায় রেখেছিলো তখন।

আবার শুয়ে পড়ে মনিরা।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চলে।

হঠাৎ শব্দ হয় কক্ষমধ্যে।

মনিরা অস্ফুট শব্দ করে উঠে—কে?

সুইচ টিপে আলো জ্বালে বনহুর।

মনিরা বলে উঠেলো— তুমি। তুমি এসেছো? নেমে দাঁড়ালো মনিরা শয্যা ত্যাগ করে।

বনহুর এগিয়ে এলো, জড়িত কণ্ঠে ডাকলো—মনিরা।

মনিরা চমকে উঠলো, স্বামীর কণ্ঠস্বর তার কাছে কেমন যেন লাগলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো মনিরা বনহুরের চোখের দিকে।

লাল টক্‌টকে ওর চোখ দুটো, কেমন যেন অভিভূতের মত তাকাচ্ছে মনিরার দিকে।

মনিরা পাথরের মূর্তির মত জমে গেলো যেন, বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো স্বামীর দিকে।

বনহুর টলতে টলতে এগিয়ে এলো, আবেগভরা জড়িত কণ্ঠে ডাকলো—কাছে এসো প্রিয়া.....

মনিরা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললো— তুমি মদ খেয়েছো।

মদ— কই না তো।

মিথ্যা কথা বলছো! খবরদার, এক পাও আমার দিকে এগুবে না। ছিঃ ছিঃ তুমি মদ পান করা শিখেছো। এতো অধঃপতনে গেছো তুমি.....

হেসে উঠলো বনহুর— দস্যুর আবার অধঃপতন। হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.....

মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে।

হাসি থামিয়ে এগিয়ে আসে বনহুর মনিরার দিকে, ওকে ধরতে যায় সে বলিষ্ঠ হাত দু'খানা বাড়িয়ে।

মনিরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠে— আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা— যাও, তুমি চলে যাও এখান থেকে! তোমাকে আমি চাই না.....

বনহুরের কানের কাছে নূরীর সেদিনের কথাগুলোর প্রতিধ্বনি হয়। বনহুর নিজকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে তাকায় বনহুর মনিরার মুখে।

মনিরা বলে— আমি ভাবতে পারিনি তুমি এতো হীন জঘন্য হতে পারো।

বনহুর ব্যথাভরা কণ্ঠে ডাকলো— মনিরা.....

মনিরা তীব্রকণ্ঠে বলেই চলেছে— দস্যুতা করে তোমার সখ মিটলো না আজও? কবে থেকে তুমি নেশা ধরেছো?

তুমিও আমাকে তিরস্কার করছো?

তুমি চলে যাও, আমি মনে করবো তুমি মরে গেছো।

মনিরা!

হাঁ, আমি সব সহ্য করে নেবো। যেমন বিনা দ্বিধায় একদিন দস্যুকে স্বামী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম, তেমনি তাকে বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করবো.....

বনহুর এবার মনিরাকে ধরে ফেলে, বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে— আর বলো না মনিরা, আর বলো না, আমি তোমাকে স্পর্শ করে শপথ করছি.....

না না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও! চাই না তোমাকে! মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ায়।

বনহুর এবার মনিরার পায়ের কাছে বসে দু'হাতে চেপে ধরে ওর পা দু'খানা— মনিরা তুমি বিশ্বাস করো, আর আমি কোনোদিন মদ স্পর্শ করবো না। আমাকে ক্ষমা করো মনিরা!

মনিরা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে, কঠিন পাষাণী দেবীর মত স্থির হয়ে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মনিরার গন্ড বেয়ে।

মনিরা পারে না আর নিজকে ধরে রাখতে, স্বামীর হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

বনহুরের আঁখি দুটিও শুষ্ক ছিলো না, সে মনিরাকে গভীরভাবে টেনে নেয় কাছে।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

বনহুর বলে—আজ থেকে এমন ভুল আর আমি করবো না মনিরা....

মনিরা ভুলে যায় সব কিছু, বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে—সত্যি বলছো?

হাঁ মনিরা, জীবনে যা করিনি কোনোদিন, তাই করেছিলাম— শপথ করলাম আর কোনোদিন আমি এ ভুল করবো না।

মনিরা বনহুরকে সেদিন কিছুতেই ছেড়ে দেয় না। ধরে রাখে সে সন্তান আর মায়ের দোহাই দিয়ে।

ভোরে তার আব্বুকে দেখে আনন্দে অধীর হলো নূর।

চৌধুরীবাড়িতে আনন্দের বান বয়ে চললো।

মরিয়ম বেগম পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ-অশ্রু বর্ষণ করলেন।

ফুলমিয়ার তো খুশি ধরছে না সে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো।

বনহুর তখন মনিরার কক্ষে বসে মনিরার সঙ্গে গল্প করছিলো।

এমন সময় নূর গতদিনের পত্রিকাখানা নিয়ে ছুটে আসে— আম্মি, আম্মি, দেখো কি দুঃসংবাদ.....

একসঙ্গে মনিরা এবং বনহুর চোখ তুলে তাকালো।

বললো বনহুর— কি দুঃসংবাদ আব্বু?

নূর পত্রিকাখানা এনে মেলে ধরলো পিতামাতার সম্মুখে— এই দেখো, কান্দাই শহরে পুনরায় দস্যু বনহুরের আবির্ভাব। আম্মি, ঐ শয়তান দস্যুটা আবার এসেছে.....

মনিরা তাকালো স্বামীর মুখের দিকে।

বনহুর হাস্যোজ্জল মুখে তাকিয়ে আছে নূরের দিকে।

মনিরা পত্রিকাসহ নূরকে টেনে নিলো কাছে— বাবা দস্যু হলেই কি সে শয়তান হয়? ছিঃ ও কথা বলতে নেই।

না আম্মি, দস্যু বনহুরকে চেনো না, তাই ওমন কথা বলছো আমাদের স্কুলে সবাই বলে— দস্যু বনহুরের মত অতবড় বিখ্যাত দস্যু নাকি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

মনিরা বিব্রত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো স্বামীর দিকে। ভেবেছিলো নিশ্চয় তার স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। কিন্তু দেখলো বনহুরের মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠেছে, অপলক চোখে তাকিয়ে আছে বনহুর সন্তানের মুখের দিকে।

এবার বনহুর নূরের পিঠ চাপড়ে বললো— তাই নাকি, দস্যু বনহুর খুব বড় দস্যু?

হাঁ আব্বু।

তুমি দেখেছো তাকে?

সর্বনাশ, দস্যু বনহুরের ভীষণ চেহারা, তাকে দেখলে.....

মনিরা এবার হেসে বললো— দস্যু হলেও সে তো মানুষ বাবা। তাকে দেখলে ভয় পাবার কি আছে?

আম্মি, তুমি বড্ড বোকা, দস্যু বনহুরকে দেখলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

বনহুর হেসে বললো— তোমার আম্মি দস্যু বনহুরকে দেখে অজ্ঞান হবে, আর তুমি যদি তাকে দেখো?

আমি একটুও ভয় পাবো না, অজ্ঞানও হবো না। আমি বড় হয়ে তাকে পাকড়াও করবো.....

চমকে উঠে মনিরা, ফ্যাকাশে হয় তার মুখ।

বনহুর নূরকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলে—সাবাস!

পরবর্তী বই
কান্দাই রহস্য

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই